যৌতুক সিরিজ—৩

উপহার

এক

সবাই জানে অজিত ছেলেটা ভাল।

সেই অজিত যে শেষ পর্যন্ত এমন একটা কাণ্ড করে বসবে কেউ তা ভাবতে পারেনি।

শুনে তো প্রথমে কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না।

দূর, তাও কি কখনো হয়! অজিতের মত নির্বিরোধী ছেলেটা গাঁয়ের বালবিধবা সুষমাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত রাতারাতি গাঁ ছেড়ে একেবারে উধাও হয়ে গেল!

বারো তেরো বছরের একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে ছাড়া সুষমার ত্রিসংসারে নিজের বলতে আর কেউ নেই। সেই কিনা অজিত ছেলেটার মাথাটা এমনি করে চিবিয়ে খেলো।

তা সে যে যাই বলুক, অজিতের ঘর-সংসার, স্ত্রী-পুত্র, স্ত্রীর কোলে একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু—এমনি করে এদের একেবারে পথে বসিয়ে দিয়ে সুষমার সঙ্গে চলে যাওয়া তার উচিত হয়নি।

দুজনে যে যুক্তি করেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে এ কথা সত্যি।

কারণ একই দিনে, ঠিক একই সময়ে তারা দুজনেই নিরুদ্দেশ। —তারপর প্রায় দু মাস হতে চলল কারও কোন পাত্তা নেই। সুষমা হতভাগী আবার তার অতবড় ধিঙ্গি মেয়েটাকে পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। মরণ আর কাকে বলে! মাগীর মুখে আগুন!

অজিতের স্ত্রী ইন্দুমতী তো একেবারে অবাক্।

দজ্জাল বলে ইন্দুমতীর গ্রামে বেশ একটু সুনাম ছিল। তার ওপর আবার এমনি একটা ঘটনা ঘটে গেল! ইন্দুমতী আগে নিজের গালেই নিজে চড় মেরে, চুল ছিঁড়ে, মাথা খুঁড়ে গালাগালি দিয়ে সুষমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করলে।

তারপর সে তার স্বামী-দেবতার উদ্দেশ্যে যে সব বাক্য উচ্চারণ করতে লাগলো তা আর মুখে আনতে নেই।

স্বামীর ঘরে অন্নের সংস্থান আছে তাই রক্ষে, তা না হলে সে যে কি করে বসত তা বলা যায় না।

কিন্তু শুধু অন্নের সংস্থান থাকলেই তো চলে না—গ্রামের বউ সে, অন্ততঃ দেখাশোনা করবার জন্যেও একজন পুরুষ মানুষের দরকার।

তা গ্রামের বউ হলে কি হয়, ইন্দুমতী একাই একশো। ইচ্ছে করলে একাই সে দশটা পুরুষের কান কাটতে পারে।

বলে—কি মনে করেছিস্ কি, ড্যাক্‌রা, পোড়ারমুখো, হাড়হাভাতে! মনে করেছিস্ মাগী জব্দ হোক। হব যে জব্দ, না হলেই নয়! তোর বাপ চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে, দুটো কাচ্চাবাচ্চা রয়েছে কোলে, নইলে দেখিয়ে দিতাম।

এই বলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে, আস্ফালন করলে ইন্দুমতী। তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী যে এসব শুনতে পাচ্ছে না, সে খেয়ালও তার নেই। গ্রামের লোককে জানিয়ে দিলে যে, জমি-জায়গা পুকুর-বাগান ইত্যাদি দেখাশোনা করা যদি মেয়েদের দিয়ে হতো, তবে কখনোই সে তার মেজ ভাইকে কাছে এনে রাখতো না।

মেজ ভাইটিও আবার তথৈবচ।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাড়িতে বসে বড় নিরানন্দে সে দিন কাটাচ্ছিল —বোনের বিপদের খবর শুনে তাকে সাহায্য করার জন্যেই সে সংবাদ পাওয়া মাত্র এখানে এসেছে।

দেখতে কিম্ভূতকিমাকার। মোটা, থলথলে শরীর, বেশী খাটুনি

তার পোষায় না, তাই সে একরকম চব্বিশ ঘণ্টাই একটা তক্তপোশের ওপর গড়াগড়ি দেয়।

সন্ধ্যার কিছু আগে শুধু একবার সে ঘর থেকে বের হয়। এখানে সেখানে কিছুক্ষণ ঘুরে, এর তার সঙ্গে কিছুটা গল্প করে আবার ঘরে ফিরে আসে। এসে আবার সেই তক্তপোশের এক প্রান্তে থপ করে বসে।

বলে—ত্যাখ্ ইন্দু, যে রকম শুনছি, তাতে সে মাগী ভারী বজ্জাত ছিল বলেই মনে হচ্ছে।

ইন্দুমতী বেশ ভাল করেই প্রশ্নের জবাব দেয়। বলে—কোন্ মাগী মেজদা?

বীরেন আর বসে থাকতে পারে না। অর্ধেকটা পা তক্তার বাইরে ছড়িয়ে কোনরকমে শুয়ে পড়ে বলে—কোন্ মাগী আবার! ওই যে রে, অজিত আমাদের যাকে নিয়ে পালালো!

কিন্তু তার স্বামী অজিত যে ইচ্ছা করে সুষমাকে নিয়ে পালিয়েছে এ কথা সে নিজে বললেও অন্য কারও মুখে শুনলে ইন্দুমতীর সহ্য হয় না, বোধহয় তার আত্মসম্মানে কোথায় যেন বাজে।

তাই সে দাদার কাছে এগিয়ে এসে কথাটার প্রতিবাদ করে।

বলে—দাদার বেশ আক্কেল যা হোক! ও যেন ইচ্ছে করে মাগীকে নিয়ে পালিয়েছে! তুমি বুঝি তাই শুনে এলে? আ! তা আর হতে হয় না। মেয়েটাকে তুমি দেখতে তো বুঝতে! বেউশ্যে হারামজাদী—ফুসলিয়ে-ফুসলিয়ে তুকতাক করে আমাদের ওকে হয়তো বলেছে যে, চল আমায় কোথাও দিয়ে আসবে চল। বাস্, নিয়ে গিয়ে আর আসতে দেয়নি। নইলে ওকে আর মাগ-ছেলে বাড়ি-ঘর ফেলে যেতে হয় না। বুঝলে?

পা নাচিয়ে ভুঁড়ি নাচিয়ে নড়বড়ে তক্তপোশটায় ক্যাঁচক্যাঁচ করে শব্দ করতে করতে বীরেন বলে—হুঁ।

বলেই খানিক আত্মস্থ হয়ে কি যেন ভেবে সে জিজ্ঞাসা করে—মেয়েটা সুন্দরী ছিল বোধহয়। তুই দেখেছিস্ তাকে ?

ঠোঁট উলটিয়ে ইন্দুমতী বলে—সুন্দরী ওকে বলে না। তার চেয়ে মাগীর মেয়েটা বরং সুন্দরী।

বলেই সে কি একটা কাজের জন্যে অন্য ঘরে গিয়ে আবার তখুনি ফিরে আসে। কথাটা বোধহয় তখনও তার শেষ হয়নি।

বলে—মাগীর রংটাই না হয় সাদা ধপধপে আর মাথায় এক মাথা চুলই না হয় আছে। তবে ঢং-ঢাং খুব। বেউশ্যে মাগীদের যেমন হয়।

বীরেন জিজ্ঞাসা করে—আগে থেকে তুই জানতে পেরেছিলি বুঝি ?

ইন্দুমতী বলে—তা জানলে কি আর কিছু বাকী থাকতো দাদা ? বঁটি দিয়ে মাগীর ওই একবোঝা চুল তাহলে···খ্যাংরা মেরে হারামজাদীর বিষ আমি নামিয়ে দিতাম না !

চিবিয়ে চিবিয়ে দাঁত কিসমিস করে কথাগুলো সে এমনভাবে উচ্চারণ করে, শুনে মনে হয়, এখন যদি সে ওই সুষমাকে একবার তার হাতের কাছে পায় তো বোধহয় তাকে হাত দিয়ে গুঁড়ো করে ফেলতে পারে।

বীরেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে—হুঁ।

বলে কিছুক্ষণ সে থেমে আবার বলে—তবে শুনলাম নাকি তাদের অনেক দিনের লট্‌ঘটি। তা প্রায় বছর দশেক হবে। কি বল্ ?

এবার ইন্দুমতী যেন রেগে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। বলে—জানি আমি, তোমাকে আমার মিছেই আনা। ওই-সব তুমি শুনে আসছ বুঝি ? বলি—এ কথা তোমায় কে বললে কে ? কই

বলুক তো আমার মুখের সামনে! কাল আমায় তাকে দেখিয়ে দিও তো। তা সে যে মিঞাই হোক—ইন্দুমতী কারও খাতির রাখে না!

এই বলে গজগজ করতে করতে ইন্দুমতী এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায় আর বলে—ছ্যাখো দেখি কথা, বলে দশ বছর। মরণ আর কি! দশ দিন হলে রক্ষে থাকতো? কেন আমি কি কানা নাকি? চোখে দেখতে পাই না?

শেষ অধ্যায়

দুই

গ্রামের অনেক লোক অনেক কথাই বলে।

বলে—বাড়ি ছেড়ে অজিত গেছে শুধু ওই ইন্দুমতীর জ্বালায়।

কেউ বলে—এতদিন যায়নি—এই ঢের।

আবার কেউ-বা তার প্রতিবাদ করে। বলে—বউ দজ্জাল হলেই বুঝি ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়? কেন পুরুষ ব্যাটাছেলে, বউ জব্দ করতে পারে না?

কিন্তু ইন্দুমতীকে যারা জানে তারা বলে—জব্দ হবার মেয়েও নয়।

সেকথা অনেকেই বিশ্বাস করে না।

বলে—কি যে বল তার ঠিক নেই। ঠ্যাঙ্গার চোটে বাঁদর জব্দ হয়, বউ তো বউ!

কিন্তু ঠ্যাঙ্গাবে কে? ওদিক দিয়ে অজিতকেও একটুখানি বিচার করে দেখা উচিত। উলটে ইন্দুমতীই যদি তাকে রাগের মাথায় দু চড় বসিয়ে দেয় তা সে রা কাড়বে না। গোবেচারা, নিতান্ত ভাল মানুষ।

ইন্দুমতীও যে তা জানে না তা নয়।

সেবার অজিতের একটা বাঁশঝাড় নিয়ে প্রতিবেশী শম্ভুর সঙ্গে বাধল ঝগড়া। ঝগড়া করবার মানুষ অজিত নয়, ঝগড়া বাধালে ইন্দুমতী।

বর্ষার জল খেয়ে খেয়ে শম্ভুর বাড়ির তিনদিকের মাটির প্রাচীরের একদিককার খানিকটা ধ্বসে গেছে। বেচারার টানাটানির সংসার —আজ খেতে কাল থাকে না, এদিক টানে তো ওদিক ফুরিয়ে যায়।

গত তিন বছর ধরে প্রাচীরের মাথার ওপর ছাদন নেই, জল খেয়ে খেয়ে প্রাচীরের মাটি নরম হয়ে গেছে। বীরভূমের মাটি বলে রক্ষা, তা না হলে প্রাচীরের অস্তিত্ব এতদিন থাকত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এ বছর বুঝি আর থাকে না। চারটি খড় দিয়ে প্রাচীরের মাথাটি ঢাকা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অথচ খড় যোগাড় হয় তো বাঁশ হয় না।

বেচারা শম্ভুর এখন মাথায় মাথায় ভাবনা—মুখখানি তার দিনরাত্রির সব সময় শুকিয়ে থাকে, ঘরে ঢুকতে ভয় হয়, বউ-এর মুখে কোনও কথা নেই, শুধু কান্না আর কান্না। বলে, কাঁদি কি সাধে? বাড়ির পাঁচিল যদি আমার পড়ে যায় তো ঘরে শেয়াল ঢুকবে তা জানো?

শম্ভু বলে—তাই বলে কেঁদো না বাপু চব্বিশ ঘণ্টা! কান্না আমার ভালো লাগে না।

বউ বলে—তোমার হাতে পড়ে আমাকে চিরজীবনই কাঁদতে হবে।

শম্ভু হঠাৎ কি ভেবে প্রতিজ্ঞা করে বসে—দাঁড়াও, যদি কাল পাঁচিলের ছাদন করিয়ে না দিতে পারি তো আমি বামুনের ছেলেই নয়।

এত বড় প্রতিজ্ঞা—যেমন করেই হোক রক্ষা না করলে উপায় নেই। খড় চারটি তো ঘরেই আছে, বাবুই-এর দড়ির একটা খাটিয়া হঠাৎ সেদিন ভেঙে গিয়ে অকর্মণ্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তারই দড়ি খুলে বাঁধা-ছাঁদার কাজ চলবে, ভাবনা শুধু বাঁশের।

সকাল হতে না হতেই একটা দা নিয়ে শম্ভু তার ঘর থেকে বের হয়ে গেল। চারদিকে অন্ধকার। তারই বাড়ির পাশে একটা পুকুরের পাড়ে অজিতের কয়েকটি বাঁশের ঝাড়। সেখানে গিয়ে শম্ভু একবার থমকে দাঁড়ালো। ভাবলে এ কাজ সে করবে

কিনা। তা হোক। হাতটা তার কাঁপতে লাগলো কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছে যে!

শম্ভু একবার এদিক-ওদিক তাকালে। অন্ধকারে দূরের জিনিস ভাল দেখা যায় না।

তখুনি সে তার হাতের দা দিয়ে জোরে জোরে দু তিনটে কোপ বসাতেই একটি বাঁশ কেটে গেল। বাঁশটা ছিল ঝাড়ের বাইরে। টেনে বের করতে বিশেষ কষ্ট হলো না।

সেইখানেই সে তাড়াতাড়ি কঞ্চিগুলো কেটে, লুকিয়ে আবার সেগুলো ঝাড়ের ভেতর গুঁজে দিয়ে সোজা বাঁশটা কাঁধে তুলে ঘরে নিয়ে এসে তাড়াতাড়ি কেটে চিরে বাখারি করে বাগদিপাড়া থেকে একজন মজুর ডেকে আনবার জন্যে বের হয়ে গেল।

কিন্তু অবাক্ কাণ্ড, পরের দিন সকালে পালে দেবার জন্যে গোয়াল থেকে গরু বাছুর খুলতে গিয়ে ইন্দুমতী দেখলে তার কালো গাই-এর ছোট বাছুরটা কোন্‌দিকে ছুটে পালিয়েছে। ছোট বাছুর, লাফিয়ে ছুটতে ছুটতে হয়তো কোথাও কোনও ফণীমনসার কাঁটার ঝোঁপে, নয়তো কোনও পুকুরের পাড় থেকে গড়িয়ে একেবারে জলে গিয়েও পড়তে পারে, তাই তার সন্ধান করা একান্ত দরকার।

ইন্দুমতী বের হয়েছিল বাছুরের সন্ধানে। পুকুরের পাড়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখলে, বাঁশের ঝাড়ের কাছে কাঁচা কঞ্চি পড়ে রয়েছে। একটা বাঁশের গোড়া মনে হলো যেন সদ্য কাটা।

চুরি করে কাটা ছাড়া আর কি হতে পারে!

চোরের উদ্দেশে ইন্দুমতীর মুখ দিয়ে অনর্গল যেন গালাগালির গুলি ছুটতে লাগল। সবাই জানলে—একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই।

বাছুরটা বাইরে যখন নেই, তখন কারও বাড়ি ঢুকতেও পারে। এ-বাড়ি সে-বাড়ি করতে করতে ইন্দুমতী গিয়ে ঢুকল শম্ভুর বাড়িতে!

ভাঙা প্রাচীর টপকে দুষ্টু বাছুর হয়তো তাদের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। কিন্তু সদর্ দরজা পার হয়ে উঠোনে পা দিয়েই ইন্দুমতী চমকে উঠল। ভাঙা প্রাচীরের কোল ঘেঁষে কতকগুলো খড়ের পাশে সদ্য কাটা কাঁচা একটা বাঁশের কতকগুলো বাখারি পড়ে আছে।

বাঁশটা কি তবে শম্ভুই চুরি করেছে নাকি?

ইন্দুমতী চিৎকার করে উঠল—বলি হ্যাঁলো ও ল-পাড়ার বউ, এ বাঁশ তোরা কোথায় কিনলি?

শম্ভু আবার গিয়েছিল মজুরের খোঁজে, তখনও বাড়ি ফেরেনি। ল-পাড়ার বউ সবেমাত্র পুকুর থেকে কাপড় কেচে ঘরে ঢুকেছে। ভেজা কাপড়েই বেরিয়ে এসে বললে—এসো, দিদি এসো।

কিন্তু অত খাতির করতে ইন্দুমতী জানে না।

মুখ ভেংচে জোর গলায় বললে—থাক্, আর আপ্যায়েতে কাজ নেই!

বলে আঙুল বাড়িয়ে বাঁশের বাখারিগুলো দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ও বাঁশটা কোথায় পেলি শুনি? তাই তো বলি, বলা নেই, কওয়া নেই, বাড়ির মড়া বের করতে ঝাড়ের বাঁশটা আমার কে কাটলে! তা এতই যদি বাঁশ অভাবে ঘরের মড়া তোর বেরোচ্ছিল না তো বললেই পারতিস্। চেয়ে নিলেই হতো একটা আটগণ্ডা পয়সার বাঁশ!

ল-পাড়ার বউ বললে—তা তুমি গালাগাল দিচ্ছ কেন দিদি, ও বাড়ি নেই, আসুক, এলে জিজ্ঞেস করো, তারপর যা হয় বোলো।

ইন্দুমতী বলে উঠল—জিজ্ঞেস আবার করব কি লা, জিজ্ঞেস করব কি? ও যে ডাঁহা আমার ঝাড়ের বাঁশ, দেখলে আমি চিনতে পারি। ওই বাঁশ—হা ভগবান, আমাকে না বলে চুরি করে যে কেটেছে, তার হাতে যেন কুষ্ঠব্যাধি হয়, ওই বাঁশে চড়ে সে যেন শ্মশানে যায়।

ল-পাড়ার বউ অবাক্‌ !

ধীরে ধীরে বললে—সকালবেলা তুমি অমন করে আর গালাগাল দিওনা দিদি, সে আসুক, জিজ্ঞেস করি, তোমার ঝাড়ের বাঁশই যদি কাটা হয়ে থাকে তো দাম দিয়ে দেবো একটাকা।

—পয়সা হয়েছে খুব, তাই পয়সা দেখাচ্ছিস, না? দাঁড়া, ছাখ তবে আমি বাঁশ চুরি করা বের.করছি। চুরি করে আবার মুখের জোর ছাখো! বলে দাম দিয়ে দেবো! এই যে, দেওয়াচ্ছি দাম!

বলতে বলতে ইন্দুমতী বেরিয়ে গেল।

অজিত তখন বাড়ির রোয়াকে বসে তামাক টানছিল, ইন্দুমতী একেবারে মারমূর্তি হয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বললে—বলি, পুরুষ ব্যাটাছেলে বাড়িতে থাকো কিসের জন্যে শুনি? তুমি মানুষ, না গরু, গাধা, না ভেড়া?

আচমকা একটু চমকে গিয়ে অজিত বললে—কেন, আজ আবার কার সঙ্গে কি হলো তোমার?

ইন্দুমতী বললে—হলো তোমার মাথা আর মুণ্ডু। শম্ভু তোমার পুকুরের পাড় থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে গেছে—ছাখোগে যাও! কাল বাদ পরশু যদি ঘরের মাগ ছেলেকে টেনে নিয়ে যায়, তাও তুমি দেখবে না। এমন ব্যাটাছেলের মুখে আগুন!

এ সবই অজিতের খানিকটা গা সওয়া হয়ে গেছে। চুপ করে বসে বসে সে তামাকই টানতে লাগল।

ইন্দুমতী বললে—বসে রইলে যে চুপ করে?

অজিত বললে—কি করতে হবে শুনি ?

ইন্দুমতী বললে—তাও কি আমায় বলে দিতে হবে? যাও—গিয়ে বাঁশটা কেড়ে নিয়ে এসো। আর নইলে তু পাঁচজন সাক্ষী রেখে, দিয়ে এসো নালিশ করে। মজাটা বুঝুক!

—আচ্ছা, তাই হবে। বলে হুঁকোটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে অজিত উঠে দাঁড়াল।

ইন্দুমতী বললে—ব্যাটাছেলে যে ভগবান তোমায় কেন করেছিলেন জানি নে। ছি ছি, কোনও কাজের নও!

অজিত সেদিকে কর্ণপাত না করে বাড়ি থেকে বের হলো।

চীৎকার করে ইন্দুমতী তাকে একবার শুনিয়ে দিলে—এর একটা প্রতিকার যদি না করতে পার তো, তুমি যেন আর বাড়ি ঢুকো না।

রোজ সকালে একবার সুষমার বাড়ি না গেলে অজিতের চলে না।

সেদিনও নিজের কাজ সেরে সুষমার বাড়ির দিকেই সে চলেছিল। পথে শম্ভুর বাড়ি।

শম্ভু তখন বাড়ি ফিরে সব কথাই শুনেছে। দরজার কাছে অত্যন্ত বিমর্ষমুখে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, কি তার করা উচিত।

এমন সময় দূরে অজিতকে আসতে দেখে মুখখানা তার সহসা বিবর্ণ হয়ে গেল।

অজিতও তাকে দেখতে পেয়েছে, তা না হলে সে পালাতে পারত, কিন্তু এখন আর পালাবার উপায় নেই। সাহসে ভর করে শম্ভু সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, আসুক সে, তার হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করবে এবং তার অবস্থাটা অজিতকে বুঝিয়ে বললে হয়তো সে তা বুঝবেও।

অজিত কাছে আসতেই শম্ভু তাকে কি যেন বলতে গেল, কিন্তু ভয়ে লজ্জায় গলাটা তখন তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

মুখ দিয়ে তার কোনও কথাই সহজে বের হলো না। একটা ঢোক গিলে, চোখ-মুখের ইশারা করে মাথাটা নেড়ে বললে—শোনো!

অজিত বুঝল, কি সে বলতে চায়। হেসে সে তাই বললে—শুনেছি।

শম্ভু তার হাত দুটো দু হাত দিয়ে চেপে ধরে বললে—চুরি করেছি ভাই, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে। আমায় ক্ষমা কর।

অজিত তার হাত দুটি ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—তা আগে নিলি না কেন হতভাগা, পাঁচিলটা যে গেল!

শম্ভু ভেবেছিল, অজিত হয়তো তাকে তিরস্কার করবে, কিন্তু তা না করে সে যে তাকে এমন কথা বলবে তা তার ধারণার অতীত। চোখ দুটো শম্ভুর জলে ভরে এলো, বললে—আমার অবস্থা তো জানিস!

অজিত বললে—তা জানি। কিন্তু একটা পাঁচিল ছাদন করতে কতই বা লাগে!

শম্ভু বললে—তাই বা হোলো কোথায়? খড় যোগাড় করলাম, দড়ি ঠিক করলাম, বাঁশ চুরি করলাম, কিন্তু ছাদন করবার জন্যে একটা লোক পেলাম না। সবাই পাঁচ আনা পয়সা চায়।

—তাও নেই?

শম্ভু একটা ঢোঁক গিলে বললে—ভেবেছিলাম চাল দেবো, কিন্তু চাল এরা কেউ নেবে না।

অজিত তার ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বের করে শম্ভুর হাতে একরকম জোর করেই গুঁজে দিয়ে বললে—নে ধর। নিয়ে এইবার কোনও একটা কাজ-কর্মের চেষ্টা দ্যাখ। এমন করে মরে যাবি যে হতভাগা।

বলেই সে সেখানে না দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। শম্ভু তো একেবারে হতভম্ব!

অবাক্ হয়ে সে অজিতের পানে হাঁ করে চেয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে।

ফিরে দাঁড়িয়ে অজিত বললে—আমাদের বউটা যদি কিছু বলে তো বলিস, চুরি করব কেন, একটা বাঁশের দাম আমি ওকে অনেকদিন আগেই দিয়েছিলাম, ওর মনে ছিল না। বুঝলি?

শম্ভু কি যেন বলতে গেল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বের হলো না। চোখ দুটো তখন তার ছলছল করছে।

ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপছে!

আর অজিত!

শম্ভুর দিকে একবার তাকিয়েই পেছন ফিরে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

তিন

এই অজিত—আর এই অজিতের স্ত্রী ইন্দুমতী।

দুজনে যেন একেবারে রাজ-যোটক!

তাদের দুজনের চেহারার অসামঞ্জস্য যেন সত্যি একটা দেখবার জিনিস।

ইন্দুমতী রোগা বেঁটে। গায়েব রং কালো। মুখের চেহারা নাকি এতটা খারাপ ছিল না—লোকে বলে, খারাপ হয়েছে শুধু নাক তুলে তুলে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে করে।

ছেলে মেয়ে দুটিও হয়েছে ঠিক মায়ের মত।

কোলের ছেলেটা যে ঠিক কার মত হবে, তা এখনও বোঝার উপায় নেই—কিন্তু হুবহু অজিতের মত যে হবে না, সে কথা চোখ বুঁজেও বলা চলে। কারণ, অজিতের গায়ের রং যেমন পরিষ্কার, শরীরের গড়ন আর মুখের চেহারাও ঠিক তেমনি। এককথায় তাকে সুপুরুষ বলা চলে।

কিন্তু ইন্দুমতীর সঙ্গে কেন যে তার বিয়ে হলো, সেটাই আশ্চর্য।

তবে অজিতের মুখে আমরা এ বিষয়ে যতটুকু শুনেছি, তাই বলি।

অজিতের এক কাকার বিয়ে হয়েছিল পরমাসুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে। বিয়ে অবশ্য অজিতের বাবাই দিয়েছিলেন—ছোট ভাইটিকে তিনি খুব ভাল বাসতেন।

কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে সাধ তাঁর মিটে গেল। মেয়েটি হলো দুশ্চরিত্রা। অজিতের কাকাই প্রথমে তা টের পেলেন,

কিন্তু আশ্চর্য, অমন সুন্দরী মেয়ে এমন সুন্দর স্বামী পেয়েও যে দুশ্চরিত্রা হতে পারে এ ধারণা কারও ছিল না।

মেয়েটিকে দেশে মার কাছে কিছু দিনের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সকলেই ভেবেছিল সাময়িক দুর্বলতার জন্যে অনুতাপ অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে মেয়েটি আবার হয়তো তাঁদেরই আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কিন্তু আশ্চর্য, প্রার্থনা করা দূরে থাক, ছ মাস পার হতে না হতেই শোনা গেল, সেখানকার একটা ছোঁড়াকে নিয়ে, কুলে কালি দিয়ে কোথায় যে সে পালিয়েছে কেউ তার সন্ধান জানে না।

অজিতের বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কাকা বলতে লাগলেন—ভালই হলো, দাদার সাধটা এবারে মিটলো।

তা সত্যই তাঁর সুন্দরী মেয়ের সাধ মিটল। পাশের গ্রামে নিতান্ত দরিদ্র এক ভদ্রলোকের চলনসই একটি মেয়ের সঙ্গে সেই ভাইয়েরই বিয়ে দিলেন। তারপর ছেলে অজিতের বিয়ে দিয়ে ইন্দুমতীকে ঘরে আনলেন।

মরবার সময় তিনি পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছেই তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেলেন যে, খুব রূপবতী দেখে আমার বংশে কন্যা যেন কখনও কেউ ঘরে এনো না বরং তার উলটো যদি হয় তো তাও ভালো।

কিন্তু তাঁর ছেলে অজিত আর পুত্রবধূ ইন্দুমতীর ঘরসংসার তিনি দেখে যেতে পারলেন না। দেখলে হয়তো তাঁর আগের মত পালটে যেতো।

প্রথম প্রথম অজিতের অবহেলা দেখে ইন্দুমতীর মনে সন্দেহ জেগেছিল এক আধ বার। হয়তো তাকে স্বামীর পছন্দ হয় না। তাই সে মাঝে মাঝে অজিতকে বলত—এক শিশি সালসা এনে দাও দেখি—খাই।

অজিত বলত—কেন ?

লজ্জায় ইন্দুমতী বেশী কিছু বলতে পারত না। বলতো—শরীরটা কেমন যেন মনে হচ্ছে আমার—একটা সালসা-টালসা খেলে যেন ভাল হয়।

অজিত মুখে বলত—দেবো। কিন্তু মনে মনে হেসে সে চুপ করে থাকত। সালসা সে এনে দেয়নি।

তারপর ইন্দুমতীর ছেলে হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাবনা তার গেছে। সেই তখন থেকে ভুলেও সে তার চেহারার কথা আর একটি দিনের জন্যেও ভাবেনি। আগে যদি বা শরীরের যত্ন একটু আধটু করত, তখন থেকে তাও সে করে না। উলটে, অযত্ন-অবহেলার অন্ত নেই।

পাড়াপড়শী কোনও মেয়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে রূপের কথা যদি ওঠে তো ইন্দুমতী বলে—রূপ কি লা, রূপ কি ? ছেলের মায়ের আবার রূপের দরকার আছে নাকি ? এই যে লোকে বলে, আমার রূপ আছে কিন্তু রং ময়লা তাতে আমার কি এসে গেল শুনি ? কোন ক্ষেতিই তো আমার হয়নি।

শেষে ক্ষেতি যখন তার সত্যিই হলো তখন আর রূপের কথা ভাববার অবসর ইন্দুমতীর নেই। সুষমাকে ও তার স্বামীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেওয়াই হলো যেন তার জীবনের একমাত্র কর্তব্য। এই কথা সে সকলের সামনে জোর গলায় জাহির করতে লাগল যে, সতীলক্ষ্মীর গর্ভে যদি তার জন্ম হয়ে থাকে আর নিজে সে যদি সতীলক্ষ্মী হয় তো স্বামী তার আবার একদিন তারই কাছে ফিরে আসবে।

ইন্দুমতীর দিন এমনি ভাবেই কেটে চলল---কিন্তু সুষমা বা অজিতের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

বিধবা সুষমা এখন সধবা হয়েছে। স্বামী অজিত আর

মেয়ে জয়াকে নিয়ে এই সুন্দরী পল্লীবধূটি কাশীবাস করতে এসেছে।

যাই হোক, এমন কিছু অফুরন্ত অর্থের ভাণ্ডার নিয়ে তারা আসেনি যে নির্ভাবনায় তাদের দিন কেটে যাবে।

ঘরের জিনিসপত্র কিনে কয়েকটা দিন পার না হতেই টাকা ফুরিয়ে গেল।

অজিত বললে—তোমার যেমন কাজ! টাকা হাতে থাকলে আর জ্ঞান থাকে না। আমার এই সব একগাদা কাপড় জামা না কিনলেই তো পারতে!

সুষমা বলে—বেশ করেছি। তুমি চুপ কর।

অজিত খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর সুষমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে—আমাকে তো প্রতিজ্ঞা করিয়ে এনেছ—কিছু করতে হবে না। আমি কিন্তু বসেই রইলাম।

সুষমাও হাসে। বলে—তাই থাকো না। পারবে থাকতে?

—কেন পারবো না? চুপ করে বসে থাকতে পেলে মানুষ কি আর কখনও কাজ করতে চায়?

—আচ্ছা, দেখা যাবে। বলে সুষমা হাসতে হাসতে তার কাছে সরে আসে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলে—একদণ্ডের জন্যেও কিন্তু তোমাকে আমার চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করে না তা জানো?

অজিত বলে—আমারও তাই।

সুষমা হেসে বলে—আঃ এমনটি যদি হতো—দুজন যদি আমরা চিরদিন ধরে এমনি বসে থাকতে পেতাম!

অজিত অন্য কথা পাড়ে। বলে—ছাখো সুষমা, জয়া যে-রকম বড় হয়ে উঠছে, ওর একটা ব্যবস্থা না করলে তো আর চলে না।

সুষমা তা জানে। বলে—জানি। কিন্তু যার-তার হাতে আমার ওই অমন সুন্দরী মেয়েকে তো আর তুলে দিতে পারি না!

অজিত বলে—দাঁড়াও, দেখি যদি একটি ভাল ছেলে পাই।

সুষমা হেসে বলে—দেখো। সঙ্গে সঙ্গে টাকার কথাটাও ভেবো।

অজিত বলে—সে ভাবনা তোমার।

সুষমা হাসতে হাসতে চলে যায়।

চার

সুষমা যাই বলুক, টাকা যে তার ফুরিয়ে এসেছে অজিত তা জানে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে যেখানে হোক একটা চাকরির সন্ধান করে সন্ধ্যার পর একেবারে হয়রান হয়ে গিয়ে বাসায় ফিরে আসে।

সুষমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—এই জন্যেই বুঝি তোমাকে আমি এখানে নিয়ে এলাম?

কথাটার মানে ঠিক বুঝতে না পেরে অজিত বলে—কেন? কি হলো?

—হলো আমার মাথা। ঘুরে ঘুরে শুকিয়ে যে একেবারে আধখানা হয়ে গেলে!

—তা হোক। আজ অতিকষ্টে একটা কাজের সন্ধান পেয়েছি। কাল থেকে সেইখানেই যাব।

সুষমা জিজ্ঞাসা করে—কাজ কতক্ষণ করতে হবে?

অজিত বলে—দোকানের কাজ। খাটতে একটুখানি হবে বইকি।

—দোকানের কাজ? দোকান খোলা থেকে দোকান বন্ধ করা পর্যন্ত? কি কাজ করতে হবে শুনি!

অজিত বলে—কেনাবেচার কাজ।

সুষমা হাত জোড় করে বলে—দোহাই তোমার! আমার জন্যে তোমায় শেষে···না, ও-কাজ তোমাকে করতে আমি দেবো না।

অজিত ভাবলে এটা নিতান্তই তার মুখের কথা। দারিদ্র্য যখন ভীষণ মূর্তিতে এসে দেখা দেয় তখন আর অত-শত বিচার করতে

গেলে চলে না। কাজ যখন সে এত কষ্টে একটা পেয়েছে, তখন সে করবেই।

কিন্তু পরদিন দেখলে, কথাটা সুষমার শুধু মুখের কথা নয়। সকালে চা খেয়ে অজিত দোকানে বেরিয়ে যাচ্ছে, সুষমা দু হাত বাড়িয়ে তাকে আগলে ধরলে।

হাসতে হাসতে বললে—না। কষ্ট আরও আমাদের হবে, খেতে যখন সত্যিই আমরা পাব না, তখন তুমি যেয়ো এই দোকানের কাজ করতে। এখন নয়।

—সে অবস্থা হতে যে আর দেরি নেই, সুষমা।

—না, এখনও সে অবস্থা হয়নি। হলে তোমাকে আমি জানাব।

অজিত অনেকক্ষণ ধরে তাকে বুঝিয়ে বললে। বললে—মেয়েটা বড় হয়েছে। ওর কাছে আমার লজ্জা হয় সুষমা। তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া আমাদের সংসারের খরচ তো আছেই। না, তুমি বুঝছ না, আমাকে যেতে দাও।

সুষমা বললে—যেতে কি আমি দেবো না বলছি! কিন্তু ও-কাজ নয় লক্ষ্মীটি। এ-কাজ না করে, অন্য ভাল কাজ তুমি যোগাড় কর।

অজিত বললে—তুমি মেয়েমানুষ, বাজারের অবস্থা তো জানো না সুষমা। কাজ পাওয়া যে কি কষ্টের তা আমি এই কদিনেই বুঝেছি। ভাল কাজ এখন আর কিছু পাওয়া যাবে না।

সুষমা খানিক ভেবে বলে—কেন, সেই যে ফটো তোলার কাজ না কি করবে বলেছিলে?

অজিত বললে—হ্যাঁ, ফটোর একটা স্টুডিও খুলব ভেবেছিলাম। কিন্তু তার জন্যে টাকার দরকার।

—কত টাকা?

অজিত বলে—তা হাজার খানেকের কম নয়।

সুষমা আবার চুপ করে হেঁট মুখে কি যেন ভাবতে থাকে।

অজিত বললে—ভাববার দরকার নেই। হলে অবশ্য ভাল হতো, কিন্তু সে সব এখন হবে না তা আমি জানি।

—তুমি তো সব জেনে বসে আছো আগে থাকতেই!

—তার মানে?

সুষমা হাসে।

মুখ তুলে অজিতের দিকে তাকিয়ে বলে—ভাববার দরকার নেই, ভেবো না। হাজার খানেক টাকা আমি তোমাকে দেবো।

উপহাস ভেবে অজিত খুব খানিকটা হো হো করে হেসে উঠল।

—হাসছো যে?

—দেবে কোত্থেকে শুনি? দিলে তো ভালই হতো। ফটো তোলার কাজ-কর্ম জানি, ভেবেছিলাম স্টুডিও একটা খুলতে পারলে ভাল হয়—কিন্তু টাকা তুমি কোথা থেকে দেবে?

সুষমা বলে—সে আমি যেখান থেকেই দিই, তোমার কি?

অজিত বলে—আমার নয়। রোজগার অবশ্য তোমরা করতে পার, কিন্তু যে বস্তুর বিনিময়ে টাকা তুমি আনবে, তা জেনে শুনে সে টাকা আমি নিতে পারব না।

সুষমা বললে—কি বললে? ভাল বুঝতে পারলাম না।

অজিত বললে—বুঝে কাজ নেই, থাক্।

সুষমা বললে—সেই ভাল।

বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাঁচ

দারিদ্র্য আসতে আর কদিন !

দেখতে দেখতে এমন হলো যে, সেদিন বাড়িওয়ালা বাড়ির ভাড়া চাইতে এসে ফিরে গেল।

অজিত রাগ করেই বললে—এবারে হয়েছে তো? এবার আর বললেও আমি চাকরি করব না। মজাটা বোঝো।

সুষমা তার হাতের চুড়ি ক-গাছা আর গলার হারটি দেখিয়ে বললে—এখনও এগুলো আছে।

অজিত বললে—লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে। সবই যাবে তা আমি জানি। আমাকে কাজ করতে না দিয়ে এখন কি সুবিধা হলো শুনি ?

—সে আমার যাই হোক। তোমার কি ?

—আমি পুরুষমানুষ, বাড়িতে রয়েছি, "পাওনাদাররা আমায় গালাগালি দিয়ে যায়। নাঃ, তোমার কথা শুনে ভারী খারাপ কাজ করেছি সুষমা, দেখি যদি কাজটা এখনও থাকে—

বলে সে বের হয়ে যাচ্ছিল, সুষমা তার হাতখানা চেপে ধরলে। —দোহাই তোমার ও-কাজ তুমি কোরো না।

—হাত ছাড়ো, বলে অজিত একরকম জোর করেই হাতখানা তার ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

দোকানের চাকরিতে তখন অন্য লোক বহাল হয়েছে। দুপুর থেকে রাত অবধি শহরের অনেক জায়গায় অজিত একটা চাকরির আশায় দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে বেড়াল। আর মনে মনে সুষমাকে দোষ দিতে লাগল। এমন মেয়ে! ভবিষ্যতের ভাবনা

একেবারেই ভাবে না, শুধু বর্তমানকে নিয়েই তার কারবার! যতক্ষণ পর্যন্ত না একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পথে দাঁড়াবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সে কাজ করতে দেবে না।

কোথাও কিছু স্থির করতে না পেরে অজিত বাড়ি ফিরল। কিন্তু ঘরে ঢুকতে গিয়েই সে অবাক্ হয়ে গেল। বাইরের দরজায় শিকল তোলা। বাড়ি ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। কারও কোনো সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই। পকেট থেকে দেশলাই বার করে তাই জ্বালতে জ্বালতে ডাকলে—জয়া! সুষমা।

কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিলে না।

উপরের তিনখানা ঘরই বন্ধ।

লণ্ঠন জ্বেলে শিকল খুলে তিনটি ঘরই সে তন্ন তন্ন করে খুঁজলে, দেখলে জয়াও নেই, সুষমাও নেই। তাই তো! তারা সব গেল কোথায়?

হঠাৎ নজরে পড়ল জলের গেলাসের নীচে একটা কাগজ চাপা রয়েছে।

অজিত তুলে নিয়ে পড়ে দেখলে, একটা চিঠি। তাতে লেখা আছে···

তোমাকে কাজ করতে দিইনি বলে তুমি রাগ করে চলে গেলে। ছোট কাজ তোমাকে যে আমি কেন করতে দিইনি তা একমাত্র আমিই জানি, আর জানেন আমার অন্তর্যামী।

সে যাই হোক, আমরা দুই মা আর মেয়ে বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হলাম। তুমি ভেবো না। আমরা দু'জনেই বোধহয় এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে আসব।

পাশের ঘরে তোমার রাতের খাবার ঢাকা রইলো। নিজে নিয়ে খেয়ো।

ড্রয়ারের ভেতর দশ টাকার একখানা নোট রেখে গেলাম।

যে-কদিন আমরা না আসি, সে-কদিন ওইটেই খরচ করে কোনও হোটেলে খাবার ব্যবস্থা কোরো।

বাড়ি থেকে বার হবার সময় সমস্ত দরজায় তালা লাগিয়ে বের হয়ো। মন খারাপ কোরো না···আমাদের জন্যে চিন্তা নেই।

ইতি

তোমার সুষমা

চিঠিখানা পড়ে অজিত তো অবাক্!

কোথায় কি প্রয়োজনে গেছে কিছুই লেখেনি। খুব সম্ভব গেছে টাকার সন্ধানে। কিন্তু মা ও মেয়ে দুজনই ওই অত রূপ নিয়ে নিতান্ত অরক্ষিত অবস্থায় টাকার সন্ধানে বের হয়ে বোধকরি ভাল কাজ করেনি।

রাত্রে যেমন পারলে চারটি খেয়ে-দেয়ে অজিত শুয়ে পড়ল। কিন্তু বিছানায় শুয়ে সারাদিনের ক্লান্তির পরে ঘুম আর কিছুতেই আসে না! কেবলই মনে হয়, তার নিজের জীবনের কথা।

পিতার মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তি সে যথেষ্টই পেয়েছে। একটা মানুষের ভাববার কিছুই নেই।

কিন্তু তার সুখের অন্তরায় হলো ইন্দুমতী।

তার পরই এলো সুষমা। সুষমাকে পেয়ে সে ভেবেছিল, জীবনে সে সত্যিই সুখী হবে। তাই গোপনতার যে গ্লানি তাদের দুজনকেই পুড়িয়ে মারছিল তা থেকে বাঁচবার জন্যেই তারা দেশত্যাগ করেছে।

এখানে তাদের মিলনের কোন বাধা নেই, বিঘ্ন নেই। জীবনে তারা যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে।

অজিত ভেবেছিল, এবারে সে নিজে কিছু অর্থ উপার্জনের উপায় করতে পারলেই পরমানন্দে দিন তাদের চলে যাবে।

কিন্তু হঠাৎ এমনি করে সুষমা যে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্যে কাউকে কিছু না বলে গোপনে গৃহত্যাগ করে গেল, তার অর্থ কি ?

তবে কি তাকে আর সুষমার ভাল লাগে না ? কিংবা তার অর্থ অন্য কিছু !

হয়তো এই বৃহত্তর জনসমাজে নিজের আর তার কন্যার রূপের ঐশ্বর্যটিকে একবার যাচাই করে দেখবার ইচ্ছা তার আগে থেকেই ছিল। নিতান্ত গণ্ডিবদ্ধ ক্ষুদ্র পল্লীজীবনে তার কোনও সুযোগ সুবিধা ছিল না বলেই কি সে তাকে ঠিক কলের পুতুলের মত নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করে ভুলিয়ে এখানে এনেছে ? এখানে তার বাধা-বিপত্তি বিধি-নিষেধ কিছু নেই। এমন কোনও কামনা যদি সত্যিই তার মনে থেকে থাকে,-তবে তা চরিতার্থ করবার এই তো চমৎকার সুযোগ।

তাই যদি না হবে তবে কেন সুষমা তাকে চাকরি করতে দিলে না ?

নারী হয়ে এমন কী তার সাহস, যার জোরে সে একা মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে গৃহত্যাগ করে বসলো ?

সবচেয়ে বড় কথা, এতদিন ধরে দুজনে দুজনকে তারা অত্যন্ত নিবিড় ভাবে ভালবেসেছে। কেউ কোনদিন কারও ভালবাসায় সন্দেহ করেনি।

আজ এতদিন পরে সেই সুষমার ভালবাসাকে ছল বলে, অভিনয় বলে ভাবতেও অজিতের অত্যন্ত কষ্ট বোধ হতে লাগল।

তাই যদি হয়, সুষমার কাছে শেষ পর্যন্ত প্রতারিত হওয়াই যদি তার অদৃষ্টলিপি হয়ে থাকে তো সে আর জনসমাজে মুখ দেখাবে না। হয় সে গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করবে, কিংবা এমন কোনও দূর দেশে চলে যাবে, যেখানে ইন্দুমতী নেই, সুষমাও নেই।

এমনি সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে অজিত কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা সে নিজেও জানে না।

পরদিন সকাল থেকে সমস্ত বাড়ি যেন খাঁ খাঁ করছে। সুষমা নেই, জয়া নেই, একা বাড়ির মধ্যে বসে থাকতেও ভাল লাগে না। স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে অজিত দালানের ধারে খাটের ওপর বসে বসে বাংলা একটি নভেল খুলে পড়তে বসল।

কিন্তু পড়তে বসেও অন্যমনস্ক হতে তার দেরি হলো না। বই তার চোখের সামনে খোলাই রয়ে গেল। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সে সুষমার কথাই ভাবতে শুরু করে দিলে।

এতক্ষণ সুষমা যে কোথায় কি করছে কে জানে। এ অঞ্চলে তার পরিচিত কেউ কোথাও আছে কিনা কোন দিনই সে তাকে জিজ্ঞাসা করেনি। পরিচিত আত্মীয়-স্বজন থাকলেও বা তার কাছেই যেতে পারত, কিন্তু না, সম্ভবতঃ তার সন্দেহই সত্য।

তাদের সেই সুদূর পল্লীগ্রামে সুষমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের দিনগুলি তার একে একে মনে পড়তে লাগল।

সে যে কী আনন্দ তা বলে বোঝাবার নয়। তবে ইন্দুমতীকে নিয়ে জীবন তখন তার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, সুন্দরী একটি নারীর স্নেহ পাবার জন্যে মন তখন তার সদাই ব্যাকুল। এমন দিনে তাদের গ্রামের মধ্যে, শুধু তাদের গ্রামের মধ্যে কেন, সে অঞ্চলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী সুষমার ভালবাসা পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

সুষমাকে এমন করে সে তার জীবনের সঙ্গিনীরূপে পেতে পারে, তা সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

তারপর দিনের পর দিন, সে কী নিবিড় ভালবাসা, সে কী ঘনিষ্ঠতা! একদণ্ডের জন্যেও কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। মনে হতো দিনগুলো যেন গায়ের উপর ভর না দিয়ে বাতাসে

উড়ে যাচ্ছে। মনে হতো স্বর্গ বলে যদি কিছু থাকে তো সে এইখানে। স্বর্গের সুখ বলে যদি কিছু থাকে তো সে সুষমাকে ভালবাসা ও তার ভালবাসা পাওয়া।

ইন্দুমতীর সঙ্গে বিয়ে হবার পর সে ভেবেছিল, যে পৃথিবীতে এত অবিচার, সেখানে ভগবান বলে কোন কিছু থাকতে পারে না। নিজের অদৃষ্টকে কত যে ধিক্কার দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। দেব-দেবীর প্রতিমার কাছে মাথা নোয়াতে তার মনে কষ্ট হয়েছে। তাদের গ্রামের কুৎসিত নিরক্ষর বরেন তাঁতীও বোধহয় সুখী, কারণ তার বউ সুন্দরী।

কিন্তু সে নিজে সুন্দর, লেখাপড়াও একটু জানে, ঘরে কোন কিছুর অভাব নেই। মনের মধ্যে শুধু একটি সুন্দরী জীবন-সঙ্গিনী পাবার সাধ। অথচ তার বেলাতেই বিধাতার এই অবিচার। এই-সব ভেবে সে দিনরাত শুধু বিধাতাকে অভিশাপ দিয়েছে। তাই ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য সব তার কাছে মিথ্যা হয়ে গেল। সুন্দরী একটি নারীকে নিয়ে সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলো। নিজের পুত্র কন্যা স্ত্রী—লজ্জা শরম ভয় সব কিছু বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলো না।

সুষমাকে পাবার আগে পৃথিবীটাকে তার অত্যন্ত নিরানন্দময় মনে হতো। বুকের ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতো, মনে হতো—সুন্দরী নারীর ভালবাসা যে পায়নি তার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে কেউ নেই।

এমন দিনে পুকুরের ঘাটে একদিন স্নান করতে গিয়ে সুষমার সঙ্গে তার প্রথম চোখে-চোখে দেখা। সুষমাকে আরও কতবার সে দেখেছে। কিন্তু এমন করে কেউ কারও দিকে কোনদিন তাকায়নি। নীরব শুধু ছুটি চোখের দৃষ্টির যে অনুচ্চারিত একটি ভাষা আছে সে কথা সেই দিনই সে প্রথম জানলে।

সেদিন সেই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন নির্জন পুকুরের ধারে কি দেখা যে তাদের হলো কেউ কাউকে আর ভুলতে পারলে না। দিনে দশবার করে নানা অছিলায় সে নিজে তাদের বাড়ি যাওয়া আসা করতে লাগল। কয়েকদিন পার হতে না হতেই কারও মনের কথা আর কারও কাছে অজানা রইলো না। তারপর একটি একটি করে বলতে গেলে সে সব অনেক কথা।

এদিকে চায়ের জল তখন গরম হয়ে ফুটে ফুটে প্রায় শুকিয়ে গেছে। কেটলিতে অজিত আবার খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগল।

সেই অবধি পৃথিবীর রং যেন বদলে গেল। যে বিধাতাকে একদিন সে অভিশাপ দিয়েছিল, সেই বিধাতার উদ্দেশে বার বার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম জানিয়েও তার তৃপ্তি হলো না।

অন্য কোনও জাতি হলে ইন্দুমতীকে সে পরিত্যাগ করে সুষমাকেই বিয়ে করত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা চলে না। অনেকদিন থেকেই গোপনতা তাদের আর ভাল লাগছিল না, লুকোচুরির একটা গ্লানি তাদের উভয়কেই বেশ পীড়িত করে তুলেছিল।

অজিত প্রায়ই বলত এমন করে আর ভাল লাগে না সুষমা। ইন্দুমতীর কাছে প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে আমি যেন অপরাধী।

সুষমা বলতো, আর আমার বুঝি তোমার চেয়ে কিছু কম?

অজিত বলতো,—তার চেয়ে, চল চলে যাই অন্য কোথাও।

—সেই ভাল। কিন্তু ঘর-সংসার ছেড়ে তুমি যেতে পারবে ত?

—কেন পারব না সুষমা? ইন্দুমতীর কাছে আর অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে কাজ নেই। চল।

এমনি করে 'চল চল' করে কিছুদিন কাটিয়ে অবশেষে ঘর ছেড়ে এসে এই পরিণাম।

সুষমার ভালবাসা কি তবে এতই ক্ষণভঙ্গুর? এত তাড়াতাড়ি

সব শেষ হয়ে গেল? সুষমার ভালবাসা যদি এতই দুর্বল, এতই ভঙ্গুর, যদি কায়মনোবাক্যে তাকে সে আজীবন ভালবাসতে না পারে তো সে ভালবাসা অজিত চায় না।

অজিত ভাবতে লাগল।

আসুক সুষমা, তারপর ভাল করে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।

জানলার সামনে ছোট একটা গলি-রাস্তা—এদিকওদিক চতুর্দিকেই প্রতিবেশী। সামনের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে সুষমার তাকিয়ে পরিচয় হয়েছে। জানলা দিয়ে যে-টুকু আলাপ হতে পারে ঠিক ততটুকু।

ওই বাড়ির একটি মেয়ে সেদিন জয়াকে দেখিয়ে বলেছিল—ও বুঝি আপনার বোন?

অজিত তখন পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

সুষমা হেসে জবাব দিলে—না, বোন নয়, মেয়ে।

মেয়েটি অবাক্ হয়ে গিয়ে জয়ার মুখের দিকে আর একবার তাকালে।

বললে—মেয়ে? চেনবার জো নেই কিন্তু। এবার তো ওর বিয়ে দেবার বয়েস বয়েছে, আহা, চমৎকার দেখতে। মেয়ের পর আর কিছু?

সুষমা সলজ্জ একটু হেসে বললে—না।

—আপনার বাড়ি যাব একদিন বেড়াতে। আপনি আসেন না কেন আমাদের বাড়ি? এই তো রাস্তার ওপর।

সুষমা হেসে বললে—যাব।

—আমরা কিন্তু ভাই বেশীদিন থাকব না এখানে, এলাহাবাদে চলে যাব।

কথায় কথায় পাছে অন্য কথা এসে পড়ে তাই সুষমা আর

তাকে কোন প্রশ্ন করতে না দিয়ে নিজেই বলে বসলো—ছেলে-মেয়ে ক'টি ?

—একটি এই কোলের, আর দুটি ছোট ছোট। একটি মেয়ে।

—তিনটি ? তবে যে আমায় বলেছিলেন ? আপনারও তো কিছু বোঝবার জো নেই।

মেয়েটি একটু হেসে চুপ করে রইল।

—ঘাটে বেড়াতে যান ?

—যাই এক-একদিন।

—তাহলে সেখানেও দেখা হতে পারে। গঙ্গার ঘাট আমার ভারী ভাল লাগে।

মেয়েটি বললে—কিন্তু ভাই বড্ড ব্যাটাছেলের ভিড়। আমার ভাল লাগে না।

সুষমা বলেছিল—তাতে আর কি হয়েছে।

জবাবটা এখনও অজিতের মনে আছে। একটা মুখের কথামাত্র। উপেক্ষা করবারই বস্তু। উপেক্ষা সে করেও ছিল। কিন্তু আজ সেই একটিমাত্র কথাই সুষমার বিরুদ্ধে অজিতের কাছে অত্যন্ত বড় বলে বোধ হতে লাগল। পুরুষ ব্যাটাছেলের ভিড় তাহলে সুষমার ভাল লাগে !

চা-এর পেয়ালাটা শেষ করে অজিত অন্যমনস্কের মত সেটা তার হাতেই ধরে রেখে জানলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে এই সব কথা ভাবছিল। সুমুখের ছাদে হঠাৎ নজর পড়তেই দেখল, ও-বাড়ির সেই মেয়েটি তার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাঙ্গা প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে এই দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ভাবছে বোধ হয় সুষমার সঙ্গে দেখা হবে। সেখান থেকে একটুখানি সরে বসবার জন্যে হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটি টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে অজিত উঠে দাঁড়াল।

সামনের ছাদ থেকে কচি গলার ডাক শোনা গেল—কাকাবাবু!

অজিত একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখে, ফ্রকপরা ফুটফুটে ছোট্ট একটি মেয়ে তাকে ডাকছে।

মহিলাটি ফিস্‌-ফিস্‌ করে কি যেন শিখিয়ে দিলে। মেয়েটি বললে—কাকীমাকে ডেকে দিন না, মা ডাকছে।

অজিত কি জবাব দেবে ভেবে ঠিক করতে পারলে না। একটু ভেবে বললে—কাকীমা তো এখানে নেই। দু'দিন পরে আসবে।

মেয়েটির মা আরও কি যেন শিখিয়ে দিলে, কিন্তু মেয়েটি আর কিছু না বলে খিলখিল করে হেসে ছুটে পালিয়ে গেল।

সেদিন আড়ালে দাঁড়িয়ে মহিলাটির মুখ অজিত বেশ ভাল করেই দেখেছে। আজও দেখলে, চলে যাবার সময় সে মাথার ঘোমটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করেই তার মুখের পানে চেয়ে পরিষ্কার তাকিয়ে একটুখানি হেসেই চলে গেল।

হয়তো উদ্দেশ্য তার মন্দ কিছু নয়, হয়তো কোন কিছু না ভেবেই সে হেসেছে, কিন্তু তার সেই হাসিটি আজ অজিতের কাছে বড় খারাপ বলে মনে হলো। মনে হলো এমনি হাসি সুষমা একদিন হেসেছিল। এও হয়তো সেই মুখেরই সগোত্র। হয়তো অপরিচিত পুরুষের পানে তাকিয়ে নির্লজ্জভাবে এমনি হাসি হাসতে এদের কারও বাধে না। সুষমাও হয়তো মেয়েটির স্বামীর পানে তাকিয়ে এমনি নির্লজ্জ হাসি হাসতে পারে।

স্বামী যে তার আছে তারই বা ঠিক কি? হয়তো সেও ঠিক সুষমার মত একজন অজিতকে পাকড়াও করে আজ কাশী কাল এলাহাবাদ করে বেড়াচ্ছে।

তারপরেই তার চোখে পড়ল ফুটফুটে কচি ওই ছোট মেয়েটির মুখখানি। আহা, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক শিশু! কণ্ঠের জড়তা তখনও কাটেনি!

তারও মেয়েটি ঠিক এতবড়ো—ছেলেটি এর চেয়ে ছোট। তারাও তাকে ঠিক অমনি করেই ডাকতো। সময় নেই অসময় নেই, খিলখিল করে অমনি মেয়েটি মধুর হাসি হেসে তার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। তার জন্যে কতদিন সে তাদের তিরস্কার করেছে, কত মেরেছে, কত কাঁদিয়েছে। তারা হয়তো জানেও না—তাদের জন্মদাতা পিতা আজ কোথায়, হয়তো তারা সন্ধান করে, কেঁদে কেঁদে ইন্দুমতীকে বলে—মা, বাবা কোথায় ?

ইন্দুমতী হয়তো বলে—চুলোয়।

কিন্তু ছেলেমেয়েরা তাদের মায়ের কথা হয়তো বুঝতে পারে না। কেঁদে কেঁদে তাদের বাবাকে হয়তো তারা আবার খুঁজে বেড়ায়।

মায়ের দোষ ছেলে বোঝে না। বড় হয়ে তারা হয়তো শুনবে, তাদের বাবা কেমন করে তাদের অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে পালিয়েছে। হয়তো সেই নিষ্ঠুর পিতার বিরুদ্ধে ঘৃণায় তাদের সারা মন ভরে উঠবে। বড় হয়ে হয়তো তারা কত কষ্টই না পাবে। পিতার দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত সন্তান না করলে আর কেই বা করবে!

ছয়

এমনি করে ভেবে ভেবে অজিতের দিন কাটতে লাগল।

কখনও ভাবে তার সন্দেহ ভুল ; সুষমা তাকে নিশ্চয়ই ভালবাসে। আবার কখনও ভাবে ভাল সে একদিন তাকে হয়তো বেসেছিল, এখন তার সে ভালবাসা মরে গেছে।

ঘরে বসে দিন যখন তার আর কাটে না, তখন সে দরজায় তালা বন্ধ করে কখনও বা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে, আবার কখনও বা তার ফটোগ্রাফার বন্ধু অনিলবাবুর স্টুডিওতে বসে গল্পগুজব করতে থাকে।

পথের ধারেই অনিলবাবুর ফটোস্টুডিও। দরজার দুটো দিক কাচের শো-কেস দিয়ে সাজানো। দোকানটি দেখতে চমৎকার। রোজগারও ভদ্রলোকের মন্দ হয় না।

এখানে এসে তারই সঙ্গে অজিতের প্রথম পরিচয়। সুষমা ও জয়াকে নিয়ে অজিত একদিন গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে যাচ্ছিল। ফটো তোলার স্টুডিও দেখে সুষমা বললে—দ্যাখো জয়ার একটা ছবি তুলে রাখা দরকার। বিয়ের সময় মেয়ে দেখতে এসে অনেকে ছবি নিয়ে যেতে চায়।

অজিত বললে—চলো তবে এক্ষুণি তুলে নিই। আমার তো ক্যামেরা নেই, নইলে আমিই তুলে নিতে পারতাম।

সেই ফটো তোলাতে গিয়েই অনিলবাবুর সঙ্গে অজিতের প্রথম পরিচয়।

দোকানের দরজার কাছটিতে একটা চেয়ার নিয়ে অনিলবাবু প্রায়ই বসে থাকেন, অজিত সেইদিক দিয়ে পার হয়ে গেলেই অনিলবাবু ডাকেন, আসুন অজিতবাবু, তামাক খেয়ে যান।

পরে আর ডাকতে হয় না। অজিত নিজেই যায়। বসে তামাক খায়। গল্প করে। অনিলবাবু একা মানুষ! কাজকর্ম একটুখানি বেশী পড়লে অজিত দুএকটা কাজও করে দেয়। বলে, কেন যে মরতে ক্যামেরাটা বিক্রি করে ফেললাম। থাকলে আজ বড় ভাল হতো।

অনিলবাবু হেসে বলেন—শখ বুঝি এখনও মরেনি ?

অজিত বলে—না মরেনি। ক্যামেরাটা থাকলে দেশ-বিদেশে ছবি তুলে তুলে ঘুরে বেড়াতাম।

একটা স্টুডিও করবার ইচ্ছা যে তার এখনও আছে সে কথা কিন্তু বলে না।

অনিলবাবু চেয়ারটা টেনে নিয়ে তার কাছে এগিয়ে আসেন। বলেন—ক্যামেরা একখানা কিনবেন অজিতবাবু ? পুরোনো একখানা আছে আমার কাছে। বিক্রি করব। তা আপনি যদি নেন তো দাম আমি খুব সস্তা করেই দেবো।

কিন্তু সস্তাই হোক আর যাই হোক অজিতের এখন তা কেনবার সংগতি নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা, দেখি।

বলেই সে অন্য কথা পেড়ে বসে। বলে—কোনও পাল-পার্বণ যোগ-যাগ থাকলেই আপনার বেশ ভাল চলে—কি বলেন ?

অনিলবাবু ঘাড় নেড়ে বলেন—হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন···আর, ধরুন, আমি যে ক্যামেরার কথাটা বললাম It is in perfect good condition. আপনি অনায়াসে নিতে পারেন। এই তো হাতেই সূর্যগ্রহণ, আপনি অনেক ছবি তুলতে পারবেন।

অজিতকে এবার উঠতে হয়। আবার বলে—আচ্ছা দেখি।

—না, দেখি নয় অজিতবাবু, কাল আমি ক্যামেরাখানা দোকানে এনে রাখব। বুঝলেন ? বলে অনিলবাবু তার হাতে ধরে আবার একবার বসাবার চেষ্টা করেন।

অজিত ভাবে, ক্যামেরার কথা বলে আচ্ছা বিপদে পড়লাম তো। বসে দু'দণ্ড গল্প করার জায়গা যদি বা একটা ছিল। আজ থেকে আবার তাও গেল।

কোনও রকমে সেখান থেকে অজিত সেদিনের মত উঠে গিয়ে পরদিন থেকে সে রাস্তা দিয়ে আর হাঁটে না। গঙ্গার ঘাটে যেতে হলে অন্য পথ দিয়ে ঘুরে যায়।

সেদিন সূর্যগ্রহণ।

কাশীর পথ-ঘাট লোকে লোকারণ্য।

অজিত ভেবেছিল যেখানেই যাক সুষমা আজ অন্ততঃ কাশীর গঙ্গায় স্নান করবার লোভ সংবরণ করতে না পেরে ফিরে আসবে।

সারা সকালটা অজিত উদ্‌গ্রীব হয়ে কাটাল। সুষমা কিন্তু এলো না।

বেলা বারোটার পর গ্রহণ লাগবে। স্নান করে হোটেলে খাবার জন্যে অজিত বের হয়ে গেল। ভাবলে ওই পথে গঙ্গার ঘাটে সে নিজেও গ্রহণ দেখে গঙ্গার জল একটুখানি মাথায় ঠেকিয়ে আসবে। সে সময় স্নান করে পুণ্য অর্জন করা তার দ্বারা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর পথে বের হয়ে অজিত দেখলে পুণ্য লোভাতুর নর-নারীর দল এরই মধ্যে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলতে আরম্ভ করেছে। যাওয়া-আসার সুবিধা করে দেবার জন্যে স্বেচ্ছাসেবকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রহণ আরম্ভ হতে তখনও দেরি আছে।

আপন মনে ভাবতে ভাবতে পথের একপাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ সেই জনতার ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, অজিত!

আচমকা ফিরে তাকাতেই দেখলে, ভিড়ের মাঝখানে কয়েকজন মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে তাদেরই গ্রামের নন্দ চক্রবর্তী বোধ হয় গঙ্গা-স্নান করতে চলেছে। চোখাচোখি দেখা হয়ে গেলে অজিত কি যে

করতো বলা যায় না। নন্দ ছিল ভিড়ের মাঝখানে। মেয়েদের ছেড়ে ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে আসতে পারলে না, সেইখান থেকেই চলতে চলতে সে 'অজিত অজিত' বলে হাঁকতে লাগল। আর সেই অবসরে কথাটা যেন সে শুনেও শোনেনি এমনি ভাবে অজিত তাড়াতাড়ি পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গলির ভেতর দিয়ে চলতে চলতে তার বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। মনে হলো সে যেন চোর, সে যেন পলাতক আসামী, জেলখানা থেকে চুরি করে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে। ধরা পড়লেই আবার তাকে জেলে যেতে হবে।—যাক্, আজ সে খুব বেঁচে গেছে। এবার থেকে এমনি-সব পাল-পার্বণের সময় কাশীর পথে-ঘাটে তাকে অত্যন্ত সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

ভাবতে ভাবতে তার বাসার দরজায় গিয়ে নিতান্ত অন্যমনস্কের মতই তালা খুললে। তালা খুলে বাইরের দরজায় খিল বন্ধ করে সরাসরি সে ওপরে উঠে গেল। ওপরে উঠে ঘরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ তার মনে হলো সদর দরজার খিলটা সে বন্ধ করেনি। তাই সে আবার তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে ভাল করে দেখে এলো।

খাটের ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে অজিত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। যাক্, এতক্ষণে মনে হচ্ছে যেন সে তার নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এসেছে। সুষমা কাছে নেই এই যা কষ্ট, তা না হলে এতক্ষণ হয়তো সে তার শিয়রের কাছে বসে মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে তাকে কত সান্ত্বনা দিতো, চাকরি পাচ্ছে না বলে কতো দুঃখ প্রকাশ করত, নন্দ চক্রবর্তীকে দেখে চোরের মত পালিয়ে এসেছে শুনলে হেসে গড়িয়ে পড়তো। সুমুখের আলনার দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার ধুতি জামা দিব্যি পরিপাটি করে সাজানো—এমনকি ঘরের কোণে সুষমার নিজের হাতে কালি-করা একজোড়া জুতো পর্যন্ত সাজানো রয়েছে।

মনে হলো বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্যে সুষমার চরিত্রে দোষারোপ করে সে অন্যায় কাজ করেছে। এমনও তো হতে পারে, সে নিজের কোন কাজ করবার জন্যে কোথাও গেছে, আবার ফিরে এসে সব বলবে—মন খুলে তার কাছে সব কথা প্রকাশ করবে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক থেকে।

কয়েকদিন পরে।

সেদিন সকালে অজিতের ঘুম ভাঙলো ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দে।

বিছানা ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা খুলতেই দেখলে একটা টাঙ্গা থেকে একজন অচেনা যুবক জিনিসপত্র নামাচ্ছে আর সুষমা জয়া দু'জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। যুবকটি টাঙ্গাওয়ালার হাতে ভাড়া দিয়ে বললে,—যাও, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না!

—আউর আট আনা টাঙ্গাওয়ালা দাবী জানালে।

যুবকটি বললে—না, আর একটি পয়সা নয়। তখন তো বলেই উঠলাম এক টাকা দেবো।

টাঙ্গাওয়ালা কি বললে বোঝা গেল না। সুষমা বললে—যাক্‌গে সুহাস, ওকে আরও দু'আনা দিয়ে বিদেয় কর।

আরও দু'আনা যুবকটি তার হাতে গুঁজে দিতেই টাঙ্গাওয়ালা বিড়বিড় করে বকতে বকতে গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

সুষমার দৃষ্টি পড়ল অজিতের দিকে।

নিদারুণ অভিমানে অজিত কোন কথা বললে না। তার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে।

মালপত্র নামিয়ে হঠাৎ সুহাস দেখতে পেলে অজিতকে। সুষমাকে কি যেন সে জিজ্ঞাসা করলে—তারপর সোজা এগিয়ে গিয়ে অজিতের

পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। বললে—আমাকে চিনতে পারবেন না। আমি—

হাসিমুখে হাত ধরে সুহাসকে তুলে অজিত বললে—চলো, ভেতরে চলো।

সুহাস ধরাধরি করে জিনিসপত্র সব একে একে ভিতরে নিয়ে গেল।

জয়া গিয়ে উনুন ধরিয়ে চা করলে। চা খেতে খেতে সুহাস অজিতের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

সুষমা গেল রান্নার যোগাড় করতে।

সুহাস তার নিজের পরিচয় নিজেই দিলে। বাঙালীর ছেলে সে—দীর্ঘদিন আছে কাশীতে। এখানে বাঙালীদের সাহায্য করবার জন্যে তার মতো আরও কয়েকজন বাঙালী যুবক একত্র হয়ে একটি দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেছে।

সুষমা সাহায্যের জন্যে গিয়েছিল তাদের কাছে। সুষমা তাকে ছেলে বলে ডেকেছিল, সুহাসও মাতৃহীন, সুষমাকে নিজের মায়ের মত দেখেছে।

সব শুনে অজিত মৃদু হাসলে।

সুহাস বললে—প্রবাসী বাঙালীদের সাহায্য করাই প্রধানতঃ আমাদের দরিদ্র-ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য—তাই জয়ার মা এই ভাবে এখানে এসে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন শুনে আমরা সাহায্য করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলাম। অনেক কষ্টে কয়দিন চেষ্টা করে আমরা তাঁকে এক হাজার টাকা যোগাড় করে দিয়েছি। উনি এতদিন আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ এলেন এখানে।

অজিত জিজ্ঞাসা করলে, এখন কি তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাবে ?

সুহাস বললে, মাকে জিজ্ঞাসা করি।

এই বলে সুহাস উঠে গেল সেখান থেকে।

গেল সুষমার কাছে।

কি তাদের কথা হয় জানবার জন্যে অজিত দোরের কাজে এগিয়ে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যা সে দেখলে—এই রকম একটা-কিছু দেখবে মনে মনে সেই সন্দেহই সে করেছিল।

পাশের একটা ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল জয়া। জয়াকে দেখেই সুহাস একবার পেছন ফিরে তাকালে। বোধহয় দেখলে, অজিত তাকে দেখছে কিনা। তারপর নিশ্চিন্ত মনে হাসতে হাসতে দু'জনে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

কি যে তাদের কথা হলো অজিত শুনতে পেলে না কিছুই।

শোনবার প্রয়োজন নেই। যা দেখলে তাই যথেষ্ট।

ঘর থেকে তক্ষুণি বেরিয়ে এলো সুহাস। তার পিছু পিছু পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো জয়া।

অজিত মুখ টিপে একটুখানি হাসলে।

মনে হলো সে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

সাময়িক উত্তেজনায় অজিত যখন সুষমাকে নিয়ে চলে আসে এখানে, তখন সে কোন দিকেই তাকায়নি। তাকায়নি সুষমার এই বাড়ন্ত মেয়েটার দিকে।

তেরো বছরের মেয়ে মনে হয় যেন পরিপূর্ণযৌবনা যুবতী।

অজিতের সেটা নজরে পড়েছে এখানে এসে।

মনে পড়ল তাদের কাশীতে আসার প্রথম দিনের কথা।

রাত্রে যখন শোবার ব্যবস্থা হলো, সুষমা যখন তার কাছে এসে কানে কানে চুপি চুপি বললে—জয়াকে নিয়ে আমি এই ঘরে শুই, তুমি ওই পাশের ঘরে শোওগে যাও, তখনই অজিতের টনক নড়লো। ছি ছি, এ সে করেছে কি!

সারারাত শুয়ে শুয়ে সে শুধু ভেবেছে আর ভেবেছে।

গ্রামে থাকতে নিদারুণ উত্তেজনার মুহূর্তে এ রকম ভাবে ভাববার অবসর সে পায়নি। তখন ভেবেছিল যে-সমাজব্যবস্থা তাকে এই-রকম ভাবে বঞ্চিত করেছে, এ যেন তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এ যেন তারই বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র। তাই সে অগ্রপশ্চাৎ কোনো-কিছু বিবেচনা না করেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই সর্বনাশা আগুনের ওপর।

এবার যদি জয়ার একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যায়, সুহাস যদি তাকে বিয়ে করে তার বাড়িতে নিয়ে যায়, অজিত খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে।

সুষমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অজিত ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

সাত

চা খেয়েই চলে গিয়েছিল সুহাস।

বলে গিয়েছিল, বিকেলে আবার সে আসবে।

কিন্তু তার আগে সুষমার সঙ্গে অজিতকে দেখা করতেই হবে। চোখে চোখে দেখা এমনিই হচ্ছে, কিন্তু ভাল করে কথা এখনও হয়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর জয়া একটা সেলাই হাতে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসলো। সুষমা এলো অজিতের কাছে।

রহস্যময়ী সুষমা! ঠোঁটের কোণে সেই হাসি। অপরূপ লাবণ্যবতী তন্বী-তরুণী। অত বড় যে মেয়ে তা সুষমাকে দেখে বুঝবার উপায় নেই।

সুষমা বললে—মুখ দেখেই মনে হচ্ছে তুমি আমাকে বকবে। অবশ্য বকুনি খাবার মত কোনও কাজ আমি করেছি বলে মনে হয় না।

বলেই হাসতে হাসতে এসে বসল অজিতের পাশে।

তার ওপর অজিতের এত যে অভিমান, এত যে রাগ, মুহূর্তের মধ্যে কোন্‌দিক দিয়ে যে কোথায় চলে গেল বুঝতে পারলে না সে।

বললে—বকুনি খাবার কাজ কিছু করনি?

—শুধু একটা করেছি।

চাঁপার কলির মত একটি হাতের একটি আঙুল তুলে বললে—শুধু ওই একটি। তোমাকে না বলে পালিয়েছিলাম।

—বলে গেলে কি হতো?

—যেতে দিতে না।

আরও কাছে সরে এসে অজিতের একটি হাত তার হাতে তুলে নিয়ে বললে—তোমাকে তো জানি, এখনও আমাকে চোখে চোখে আগলে আগলে বেড়াবার সাধ!

শুধু একটু 'হুঁ' বলে অজিত চুপ করে রইলো। বোধ করি ভাবতে লাগলো—এ কথাটা কেমন করে বলবে।

সুষমা জিজ্ঞাসা করলে, এ ক'দিন কোথায় ছিলাম, কি করলাম সুহাস তোমাকে বলেনি?

অজিত বললে—সামান্য কিছু বলেছে।

-তবু কতটুকু বলেছে শুনি?

—আমার মুখ থেকে নাই-বা শুনলে? তুমিই বল না।

সুষমাই বললে শেষ পর্যন্ত।

বললে—গঙ্গার ঘাটে পরিচয় হয়েছিল একটি মেয়ের সঙ্গে। কম বয়সে বিধবা হয়েছে মেয়েটি। ছেলেপুলে নেই। ভারি ভাল মেয়ে।

অজিত বোধ করি তাকে রাগাবার জন্যেই বলে বসলো—দেখতে কেমন? তোমার মতন?

কথাটা অজিত কেন বললে—বুঝতে দেরি হলো না সুষমার। সে এক অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে মুখ টিপে হেসে বললে—জানি না—যাও!

অজিতের একটা হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল সুষমা। হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে—শুনবে তো শোনো, নইলে আমি চললাম।

এবার অজিতই সুষমার একখানা হাত চেপে ধরলে।

বললে—তা যাবে বই-কি! যেতে দেবে কে? নাও বল।

সুষমা বললে—বাড়ি তার অনেক দূরে। গৌরীগঞ্জ পেরিয়ে, ভেলুপুরার ওই পাশ দিয়ে গিয়ে—সে অনেক—অনেকখানি পথ। আমাকে দেখেই তো মাধবী একেবারে আহ্লাদে আটখানা। আমি গিয়েছিলাম টাকার জন্যে। বললাম, টাকার অভাবে মেয়েটার বিয়ে

দিতে পারছি না ভাই, তাই বেরিয়েছি টাকার সন্ধানে। তেরো চোদ্দ বছরের মেয়ে—দ্যাখো না কি রকম ধিঙ্গি মাগী হয়ে উঠেছে।

জয়াকে মাধবী আগেই দেখেছিল। আবার দেখলে। বললে, এত কম বয়সে এই মেয়ের বিয়ে দেবে? বিয়ের নাম শুনলে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে ভাই। আমারও বিয়ে হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়সে। দুটি বছর পেরোতে না পেরোতেই লীলা খেলা সব শেষ। তোমারও তো শুনলাম ভাই। তবু এই কম বয়সে মেয়ের বিয়ে দিতে চাচ্ছ কেন?

ভারি মুশকিলে পড়ে গেলাম। কী যে বলবো বুঝতে পারছিলাম না। তবু বললাম, না ভাই, এ মেয়েকে আর রাখা যায় না।

মাধবী জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ের সম্বন্ধ কোথাও করেছ নাকি?

বললাম, না ভাই। হাতে একটি পয়সা নেই। সম্বন্ধ করবো কোন্ সাহসে?

মাধবী বললে—এসেছ যখন, থাকো দু'একদিন, দেখি কি করতে পারি।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা মাধবী ডাকলে সুহাসকে। সুহাস মাধবীর ভাই। আপন ভাই নয়। বলছি, দাঁড়াও। সে এক ভারি মজার ব্যাপার!

অজিত বললে—সেই মজার ব্যাপারটাই বল। কারণ সুহাস তাদের দরিদ্র-ভাণ্ডার থেকে কেমন করে এই দরিদ্র মেয়েটিকে এক হাজার টাকা যোগাড় করে দিয়েছে শুনেছি। হ্যাঁ ভালকথা, সুহাস কি এই কন্যাদায়গ্রস্ত মেয়েটিকে ভিক্ষের জন্যে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি নিয়ে ঘুরেছিল?

সুষমা বললে—না, কোথাও নিয়ে যায়নি। সুহাস শুধু বলেছিল আমাদের ক্লাবের ছেলেদের বলে দিয়েছি, তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে

ঘুরে টাকা সংগ্রহ করছে। সেই জন্যেই তো এত দেরি হলো। আর মাধবীও ছাড়তে চাইছিল না।

অজিত বললে—আরও কিছুদিন থাকলে হয়তো আরও কিছু বেশী টাকা পেতে।

—হ্যাঁ তা হয়তো—বলেই সুষমার কি যেন মনে হলো। অজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—তার মানে?

অজিত বললে—মানে আর কিছুই নয়। দরিদ্র-ভাণ্ডার না কচু, সুহাস নিজেই ধার ধোর করে টাকাটা দিয়েছে।

সুষমা বললে—ধেৎ তা কেন দিতে যাবে? সুহাস খুব ভাল ছেলে।

—মন্দ তো আমি বলছি না তাকে।

সুষমার সেই সুন্দর হাতখানি নাড়াচাড়া করতে করতে অজিত বললে—আমি শুধু বলছি—কাশীর মানুষগুলি আজকাল দেখতে পাচ্ছি খুব দয়ালু হয়ে উঠেছে। কার কন্যা, কি রকম দায় সে-সব কথা আজকাল কেউ শুনতেও চায় না, দেখতেও চায় না। শুধু 'কন্যাদায়' কথাটি বললেই হলো, ব্যাস্, ঝপ্‌ঝপ্ টাকা ফেলে দিতে থাকে।

সুষমা বললে—খালি খালি আমাকে দুঃখ দেবার জন্যে বাঁকা বাঁকা কথা বলতেই শুধু জানো। তা বেশ তো সুহাস যদি টাকাটা নিজে থেকেই দিয়ে-থাকে তো দিক্ না। সুহাসের অবস্থা খুব ভালো।

অজিত আবার একটু হাসলে। রীতিমত বাঁকা হাসি। বললে—এক কথায় বলে বসলে, দিক্ না। অর্থের সঙ্গে অনর্থ এসে জুটতেও তো পারে। মা আর মেয়ে—দু'জনেই সুন্দরী। তার ওপর গরিব। টাকা দিয়ে তাদের যদি কিনে নেওয়া যায় তো মন্দ কি? আমার টাকা থাকলে আমিও দিতাম।

সুষমা এবার সত্যিই রাগ করলে। বললে—ছাড়ো!

এই বলে হাতটা সে তার ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে। বললে —টাকা কি সে আমাকে দেখেই দিয়েছে বলতে চাও? ছি! সুহাস আমাকে 'মা' বলে ডাকে।

অজিত এবার আর এক প্যাঁচে ফেলে দিলে তাকে! বললে—মাধবী তার দিদি বলছো, তুমি তার সেই দিদির বন্ধু। দিদির বন্ধুকে 'দিদি' না বলে 'মা' বললে কেন? এইবার বুঝে নাও—সুহাসের নজরটা কোন্ দিকে?

—জয়ার দিকে?

—নিশ্চয়ই। এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

সুষমা কি যেন ভাবলে, বললে—ঠিক বলেছ। বামুনের ছেলে। অবস্থা ভাল, কেউ কোথাও নেই। ওর সঙ্গেই যদি জয়ার বিয়ে দিই? মন্দ তো হয় না।

অজিত বললে—তুমি কী গো? একসঙ্গে রইলে, তোমার নজর কোন্‌দিকে ছিল? এটা তুমি আজকে ভাবছো?

সুষমা স্বীকার করলে। বললে—হ্যাঁ, আজ ভাবছি। তার কারণ জানো? তোমাকে ছোট কাজ করতে দেব না বলে ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে তো গেলাম। মাধবীর কাছে টাকা চেয়েই মনে হলো—ছি ছি! এ আমি করলাম কি? মেয়ের বিয়ে দেবো বলে ভিক্ষে চেয়ে বসলাম তো! ভিক্ষে চাওয়াটা কি ছোট কাজ? তার ওপর আবার আর একটা চিন্তা। টাকা তো মেয়ের বিয়ের জন্য নয়, টাকা তোমার ক্যামেরা আর স্টুডিওর ঘর ভাড়ার জন্যে, আমাদের দিন চালাবার জন্যে। দিনরাত আমি শুধু এই কথাই ভাবতাম। আর কোনও দিকে নজর দেবার অবসর ছিল না আমার।

অজিত বললে—বুঝলাম। এখন বল তো শুনি—সুহাসের সঙ্গে তোমার বন্ধু মাধবীর সম্বন্ধটা কি রকম? তোমার আর আমার মত নয় তো?

সুষমা এবার অজিতের গায়ে এক চড় মেরে বসলো।

অজিত বললে—দেশ থেকে কাশীতে এসে এই কাণ্ডই তো করে অনেকে। ধরো—আমাকে যদি তোমার দাদা বলে পরিচয় দাও—বাস্, কেই বা জানছে, কেই বা শুনছে। তার ওপর নিজে বিধবা। স্বামী তো বলা চলে না।

সুষমা বললে—না। সে রকম কিছু হলে আমি বুঝতে পারতাম। শোনো তাহলে সেই কথাটাই বলি। মাধবী আর সুহাস দুই সহোদর ভাই বোন নয়। অথচ মাধবীর বাবাই তার বিষয় সম্পত্তি দুই সমান ভাগে ভাগ করে এক ভাগ দিয়েছে মাধবীকে, এক ভাগ দিয়েছে সুহাসকে।

অজিত হাসতে হাসতে বললে—এ যে জটিল রহস্যের মধ্যে গিয়ে পড়লাম দেখছি। বল—শুনি।

সুষমা বললে—বর্ধমান জেলার একটা গ্রামে ছিল তাদের বাড়ি। মাধবীর বাবা ছিলেন মস্ত বড় জমিদার। বিষয়-সম্পত্তি ছিল অনেক। দু'টো কলিয়ারি ছিল। এদিকে সংসারে মানুষ বলতে ছিল শুধু মাধবীর মা আর মাধবী। ওই একটিমাত্র মেয়ে। খুব আদরের মেয়ে। মাধবীর মার কিন্তু অসুখ লেগেই থাকতো বারো মাস। তার ধারণা হলো সে মরে যাবে। এত বড়লোকের স্ত্রী, জীবনে সুখ শান্তি কিছুই পেলে না। একটি মাত্র মেয়ে—তারও যদি বিয়ে থা দিয়ে ছেলে-পুলে ঘর-সংসার দেখে যেতে পাবতো তাহলেও বা মরতে তার এত কষ্ট হতো না। অথচ মাধবীর বয়স তখন মাত্র বারো-তেরো বছর। পাতলা ছিপছিপে সুন্দরী মেয়ে—দেখলে মনে হতো বিয়ের বয়স হয়নি। কিন্তু মা তার ছাড়লে না কিছুতেই। চোদ্দ বছর বয়েসে মাধবীর বিয়ে দিয়ে দিলে। ছেলেটির বাড়ি ছিল বীরভূম জেলায়। বড়লোকের ছেলে নয়। গরিবের ছেলে। দেখতে শুনতে ভাল। মাধবীর সঙ্গে মানিয়েছিল চমৎকার। মাধবীর বাবার

ইচ্ছে ছিল—জামাইটিকে নিজের বাড়িতে এনে রাখবেন। জামাই তখন কলকাতায় বি-এ পড়ছে। বি-এ পাস করে এম-এ আর ল' পড়বে, তারপর উকিল হবে—এই ছিল ছেলেটির ইচ্ছে। বিয়ের পর মাধবীর সঙ্গে ভাব হলো তার খুব। কলকাতা থেকে ঘন-ঘন আসতে লাগলো মাধবীর কাছে। সেই বছর তার বি-এ পরীক্ষা। মাধবী বলতো, 'এমনি করে বউ-এর মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকলে তুমি পাস করতে পারবে না। আমি তখন লজ্জায় মরে যাব।' ছেলেটি বলতো, 'কখ্খনো না। আমি প্রতি শনিবারে তোমার কাছেও আসবো, বি-এ পাসও করবো দেখো।'

শনিবারে আসতো, শনিবার রাত্রে থাকতো, রবিবার সারা দিনরাত থাকতো, তারপর সোমবার সকালে উঠেই সে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতো। বাড়ির কাছেই ছিল রেল-স্টেশন! খুব বেশী কষ্ট হতো না। এমনি করেই বি-এ সে পাস করলে। বি-এ পাস করে এম-এ আর ল' কলেজে ভরতি হলো। এবার আর প্রতি শনিবারে আসা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। বলল, পড়ার চাপ পড়েছে একটু বেশী।

হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে এক টেলিগ্রাম!

টেলিগ্রাম পেয়ে মাধবীর বাবা গেলেন কলকাতায়। গিয়ে দেখলেন, জামাই হাসপাতালে। হোস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ তাকে দয়া করে হাসপাতালে ভরতি করে দিয়েছেন। ডাক্তারেরা বললেন, তার টি-বি হয়েছে।

মাথাটা ঘুরে গেল মাধবীর বাবার।

তারপর বুঝতেই পারছো—অনেক টাকা খরচ করে মাধবীর বাবা তার চিকিৎসা করালেন। স্যানিটোরিয়ামে পাঠালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং-এর একটি স্যানিটোরিয়ামে জামাই মারা গেল।

মাধবী বিধবা হলো ষোলো বছর বয়সে।

মাধবীর মা তো মরেই ছিলেন। এই খবরটা পেয়ে আর বেশীদিন রইলেন না।

মাধবীর বাবা তাঁর দেশের বিষয়-সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে চলে এলেন কাশীতে। সঙ্গে এলো সুহাস।

অজিত জিজ্ঞাসা করলে—এত জায়গা থাকতে কাশীতে এলেন কেন?

সুষমা বললে—বাপের ইচ্ছে ছিল মাধবীর আবার বিয়ে দেবার। একটি ছেলেও ঠিক করেছিলেন তিনি। কিন্তু মাধবী বেঁকে বসলো। বললে, বিয়ে সে করবে না।

অজিত বললে—সুহাস ওর নিজের ভাই যখন নয়, তখন সুহাসকে বিয়ে করলেই পারতো।

সুষমা বললে—সেকথা আমিও ভেবেছিলাম একবার।

—মাধবীকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

—জিজ্ঞাসা করেছিলাম। প্রথমে বললে, সুহাস আমার চেয়ে বয়সে ছোট। তারপর বললে, ছেলেবেলা থেকে দুজনে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি ভাই-বোনের মত। সেকথা কোনোদিন ভাবতেও পারিনি।

অজিত জিজ্ঞাসা করলে—সুহাসকে ওরা পেলে কোথায়?

সুষমা বললে—সে এক ভারি মজার গল্প। শুনবে নাকি?

অজিত বললে—জয়ার সঙ্গে ওর যদি বিয়ে দিতে হয়—শুনতে আমাকে হবেই। বল।

সুষমা তখন সুহাসের গল্প বললে।

মাধবীদের গ্রামে, মাধবীদের বাড়ীর পাশেই ছিল দুই স্বামী আর স্ত্রী। দরিদ্র ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী, স্বামী সামান্য কিছু রোজগার করতো—তাইতেই দুজনে তাদের দুঃখের ভাত সুখ করে খেতো।

স্বামীর মনে কোনও দুঃখ ছিল না, কিন্তু স্ত্রীর মনে ছিল। বলতো আমার যদি একটা ছেলে থাকতো!

নিঃসন্তান ছিল তারা।

স্বামী বলতো, ছেলে না হয়েছে আমাদের ভালই হয়েছে। ছেলে আমরা মানুষ করতে পারতাম না।

স্ত্রী বলতো, কেন?

স্বামী বলতো, টাকা কোথায়? টাকা না থাকলে আজকাল ছেলেমেয়ে মানুষ করা যায় না।

স্ত্রীর সেই এক কথা! দেশ-দুনিয়ার সব মানুষেরই তো ছেলেমেয়ে আছে! টাকা যাদের নেই তাদের ছেলেমেয়েরা মানুষ হচ্ছে না?

স্বামী বলতো, হবে না কেন? হচ্ছে। গরুবাছুর জন্তু-জানোয়ারের মত।

স্ত্রী বলতো, তাও ভালো। তবু আমার দুঃখের দিনে আঁকড়ে ধরবার মত একটা কিছু অবলম্বন পেতাম। আমাকে মা বলে ডাকতো।

—জানোয়ারের মা হয়ে লাভ কি?

স্ত্রী হাসতো। বলতো, তোমার-আমার ছেলে হবে ভালবাসার সন্তান। সে জানোয়ার হবে কেন? লেখাপড়া না শেখাতে পারলে অশিক্ষিত হতে পারে, জানোয়ার হবে না কখনও। আমাদের ছেলের মন হবে পবিত্র নির্মল।

স্বামী বলতো, ওই আনন্দেই থাকো। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ?

—কি কথা?

—আমাদের বয়েস হয়েছে। হিসাব করে দ্যাখো, ছেলে বড় হবার আগেই আমরা মরে যাব। সেই রকম একটি ছোট ছেলেকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে যাওয়া, পাপ হবে না? কী আছে আমাদের যে দিয়ে যাব ছেলেকে?

স্ত্রী বলতো, ওই জন্যেই বুঝি ছেলে চাও না তুমি ?

স্বামী বলতো, হ্যাঁ। চেয়েছিলাম যখন, তখন হয়নি। এখন আর চাই না।

স্ত্রী হয়তো তখনকার মত বোঝে। কিন্তু খানিক পরে আবার যে-কে সেই।

সন্তানহীনা নারী। মনকে কত রকমে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু মন তার মানতে চায় না কিছুতেই।

শেষে এমন হয় যে স্ত্রী তার স্বামীকে সন্দেহ করতে থাকে। বলে, তবে কি তুমি আমাকে কোনও ওষুধ-টষুধ খাইয়ে দিয়েছ নাকি ?

স্বামী অবাক হয়ে তার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়। এমন কথা তো সে কোনদিন বলে না ?

স্ত্রী বলে—যেদিন থেকে তুমি ছেলে চাও না বলেছ, সেইদিন থেকে মাথাটা আমার কেমন যেন খারাপ হয়ে গেছে !

স্বামী বলে—ওষুধ তোমাকে খাওয়াইনি কিন্তু এবার বোধহয় খাওয়াতে হবে।

—কেন ? না, আমি ওষুধ খাব না।

স্বামী হাসে। বলে—সে-ওষুধ নয় গো, পাগলের ওষুধ। আমার ভয় হচ্ছে, তুমি কোন্‌দিন পাগল না হয়ে যাও !

পাগল হতে বাকি কিছু রইলো না শেষ পর্যন্ত।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁগা, মানুষ যখন মরে তখন তার খুব কষ্ট হয়, না ?

স্বামী বলে—কষ্ট হবে না ! এতদিনের এই চেনা পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হয় বই কি ! মাধ্যাকর্ষণ কাকে বলে জানো ?

—যাক, ও সব বড় কথা তুমি বুঝতে পারবে না।

স্ত্রী বলে—আমি বুঝতে চাইও না।

বলেই খানিক থেমে বিনীত কণ্ঠে সে তার স্বামীকে অনুরোধ করে, আমার একটা কথা রাখবে ?

—কি কথা বল ?

স্ত্রী বলে—যেমন করে পারো তুমি আমাকে এক ভরি আফিং এনে দাও।

সর্বনাশ ! বৌটা বলে কি !

স্বামী বলে—এবার তুমি কি আমাকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে জেলে পাঠাতে চাও নাকি ?

স্ত্রী হেসে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে তার স্বামীর গায়ের ওপর। বলে—না না, তুমি বেঁচে থাকতে আমি আত্মহত্যা করব না। সে ভয় কোরো না। কিন্তু ছাখো, আমার শুধু কি ভাবনা হয় জানো ? না যাক্, বলবো না।

বলতে বোধহয় সে পারে না। এতবড় নিষ্ঠুর কথাটা সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে কেমন করে ?

স্বামী কিন্তু ছাড়ে না কিছুতেই। জেদ ধরে বসে।—তোমাকে বলতেই হবে।

স্ত্রীকে বলতেও হয় শেষ পর্যন্ত। বলে—ছাখো, সেদিন এ ভয়টা তুমি আমার মনের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছ।

—কিসের ভয় ?

—মরবার ভয়।

—আফিং খেয়ে মরাটা বুঝি খুব সুখের ?

স্ত্রী বলে—না না, তুমি বুঝতে পারছ না আমার কথাটা। ভগবানকে আমি দিনরাত ডাক্‌ছি। বলছি—আমার আর কিছু চাই না ঠাকুর, ছেলে মেয়ে দিলে না, সংসার দিলে না, এখন যে দেওয়াটা তোমার পক্ষে খুব সহজ সেইটি দাও। আমার মৃত্যু দাও। স্বামীর কোলে মাথা রেখে যেন আমি মরতে পারি !

—তাই বুঝি আফিং আনতে বলছো আমাকে? ফট্ করে কোন্‌দিন দেবে খেয়ে, তারপর মর্ ব্যাটা তুই জেল খেটে!

—জেল খাটবে কেন?

—জেল খাটতে হয়। আইন আছে। ধরো, আফিং খেয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে চাইলে, কিন্তু পারলে না মরতে। ডাক্তার এসে আফিংটা পেট থেকে বের করে তোমাকে বাঁচিয়ে দিলে। তখন তোমার জেল হবে।—বলবে, কেন তুমি এমন করে মরতে চেয়েছিলে?

—বা-রে, আমি বাঁচতে চাই না বলেই মরতে চেয়েছি।

—না, আত্মহত্যা করতে চাওয়াও অপরাধ। ইচ্ছে করলেই তুমি আত্মহত্যা করতে পারো না। আইন অনুসারে দণ্ড পেতে হয়।

—এ তো বেশ আইন! ধরো আমি মেয়েছেলে—রোজগার করতে পারি না, খেতে পাই না, পরতে পাই না—মরতে চাই। তুমি আমাকে খেতে পরতেও দেবে না, মরতেও দেবে না?

—না। দেওয়া উচিত নয়।

—উচিত নয় তো বুঝলাম। কিন্তু ধরো, যদি সত্যিই মরে যাই, তখন কাকে দণ্ড দেবে?

—কাছাকাছি যে থাকবে—তাকে বলবে, আফিং সে পেলে কোথায়? তারপর বলবে, মরলো কেন? মরবার কারণটা কি? ঝগড়া করেছিলে নিশ্চয়। হয়ত বলেছিলে—তুমি মরলে আমি বাঁচি। সব নানান্ রকম প্যাঁচে ফেলবার চেষ্টা করবে।

স্ত্রী বললে—তাহলে শোনো। সত্যি কথাটা বলি। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে আমি আফিং চাইছি না। আফিংটা এনে দিলে আমি লুকিয়ে রেখে দেবো নিজের কাছে। তারপর ধরো—

কথাটা বলতে পারছিল না স্ত্রী। স্বামী তার মনের কথাটা বলে

দিলে। বললে—আমি যদি তোমার আগে মরে যাই, তখন খাবে। এই তো?

বলেই সে তার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে, দু চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে এসেছে।

—তা কাঁপছো কেন, এতে কান্নার কি হলো?

—হলো না? বলেই স্ত্রী তার কাছে এগিয়ে এলো। হাঁটুর কাছে বসে পড়ে বললে, যম রাজার তো বুদ্ধি বিবেচনা কিছু নেই। সত্যি সত্যি তাই যদি হয়, তখন কী করব আমি? কি নিয়ে বাঁচবো? কেমন করে বাঁচবো?

এই বলে খুব খানিকটা কেঁদে নিয়ে চোখ মুছে বললে, হ্যাঁগা, শুনেছি নাকি আফিং খুব তেঁতো। কেমন করে খায়? কতটা খেলে মরে?

স্বামী বললে—তা আমি কেমন করে বলবো বল। আমি তো কখনও খাইনি—

—এনে দেবে তো?

স্বামী বললে—কী পাগলামী করছো!

—এইটে পাগলামী হলো?

—হ্যাঁ হলো। কে আগে মরে তার ঠিক নেই। এখন থেকে তুমি ভেবেই মরে গেলে!

স্বামী পালিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। বললে—মরাটা যদি এত সহজ হতো, তাহলে অনেকে আত্মহত্যা করতো। আফিং খেয়েও অনেকে মরে না তা জানো? বেঁচে থাকতে মানুষ এত ভালবাসে যে আত্মহত্যা করতে গিয়েও দেখা গেছে, মরবার ঠিক আগের মুহূর্তে মানুষ বাঁচবার জন্যে ছটফট করেছে, ক্রমাগত বলেছে, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমি ভুল করেছি।

স্ত্রী বলেছে—তা যে যা বলুক। আমি বলব না।

স্বামী কিন্তু আফিং তাকে এনে দেয়নি।

তখন নিজেই সে লুকিয়ে লুকিয়ে পাড়ার একটি বজ্জাত মেয়েকে টাকার লোভ দেখিয়ে এক ভরি আফিং আনিয়ে চুপি-চুপি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল।

কিন্তু বিধাতার কি অদ্ভুত রসিকতা—তার পরেই স্ত্রী হলো অন্তঃসত্ত্বা, হবে না হবে না করে শেষ বয়সে তাদের হলো একটি ছেলে।

স্বাস্থ্যবান সুন্দর ছেলে।

স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটলো। ছেলেকে পেয়ে সব কিছু সে ভুলে গেল।

স্বামীও যে আনন্দিত হলো না তা নয়, তবে দিবারাত্রি শুধু বলতে লাগলো, কেন এলি বাবা? কি সুখ করতে এলি এখানে?

স্ত্রী বলে—ও কি বলছো? আমি নিজে না খেয়ে ওকে খাওয়াব।

স্বামী হাসে। বলে—ওকথা সবাই বলে। নিজেরই যার খাবার নেই সে তার ছেলেকে খাওয়াবে কি? আর খাওয়াটাই তো সব নয়। কুকুর বেড়াল জন্তু জানোয়ারের বাচ্চা তো নয় যে পেট ভরলেই আনন্দ! মানুষের আনন্দের আকাঙ্ক্ষা যে অনেক বড়। ওকে জ্ঞানলাভ করতে হবে, বিদ্যালাভ করতে হবে!

—তুমি বাপ, যেমন করে পারো করবে।

স্বামী বলে—সে অবসর পাবো কেমন করে। ওর যখন বিদ্যালাভ করবার বয়স হবে, তখন আমরা থাকবো নাকি!

—দ্যাখো ওসব কথা বলে আমাকে ভয় পাইয়ে দিও না।

স্বামী বলে—ভয় তোমাকে পাওয়াচ্ছি না, ভয় নিজেই পাচ্ছি। কোথাকার কোন্ পাপীতাপী এলো আমাদের কাছে, আমাদেরও কষ্ট দেবে, নিজেও কষ্ট পাবে। এ হলো গিয়ে আমাদেরই পাপের শাস্তি।

স্ত্রীর কিন্তু ভাল লাগে না এইসব কথা শুনতে। বলে—ও এসেছে নিজের ভাগ্য নিয়ে। ওর ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। তুমি চুপ কর।

কিন্তু এমনি মজা, ছেলের বয়স যখন দেড় বছর—দিব্যি হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন তার জীবনে নেমে এলো এক সর্বনাশা অন্ধকার।

দশদিন আগে যে-মানুষটি ছিল সুস্থ সবল, শরীরে যার রোগ ব্যাধির চিহ্ন মাত্র ছিল না, সেই মানুষ—ওই ছেলের বাপ, শরীরটা খারাপ বলে বিছানায় শুয়ে পড়ে আর উঠলো না। মৃত্যুর আগে তার জ্ঞান ছিল না তাই রক্ষে। থাকলে কি হতো বলা যায় না। ওই শিশুপুত্র আর নিতান্ত সহায়-সম্বলহীনা স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারতো—মৃত্যু কত সুখের।

ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিল ছেলের বাপ।

বাঁচতে চেয়েছিল প্রাণপণে, কিন্তু এ পৃথিবীতে সব চাওয়াই হয়ত-বা পাওয়া যায়, কিন্তু এই বাঁচতে চাওয়ার বেলাই যত গোলমাল। দিন যার ফুরিয়ে এসেছে, কোন্‌দিক থেকে কেমন করে মৃত্যু তার শিয়রে এসে দাঁড়ায় কেউ তা বুঝতে পারে না।

ছেলের মা চিৎকার করে কেঁদে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো স্বামীর মৃতদেহের ওপর। কান্না শুনে লোক জড়ো হয়ে গেল।

মাধবীদের বাড়ী ছিল তাদের পাশেই। মাধবীর বাবাই গ্রামের মধ্যে একমাত্র গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি এসে সবই দেখলেন। লোকজন দিয়ে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময়—সে এক সকরুণ দৃশ্য—যারা দেখলে তাদেরই চোখে জল এলো। স্ত্রী তখন উন্মাদিনী। স্বামীর মৃতদেহ সে ছাড়বে না কিছুতেই। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সে কী মর্মভেদী কান্না!

মৃতদেহ যদি-বা জোর করে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হলো, স্ত্রী তার মুখাগ্নি করতে যেতে চাইলো না। সেইখানেই আছাড় খেয়ে পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো।

মাধবীর বাবা বললেন—দেড় বছরের ছেলে, তা হোক্, ওকেই নিয়ে যাও।'

পাড়ার একটা মেয়ে কোলে করে নিয়ে গেল ছেলেটাকে।

মাধবীর বাবা বললেন—ছেলেটাকে আর শ্মশান পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে না। গ্রামের বাইরে একটা আম-গাছের তলায় মড়া নামিয়ে ছেলেটার হাত দিয়ে বাপের মুখে একটু আগুনের পল্‌তে ঠেকিয়ে আবার ছেলেটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো বাড়িতে। ওর মা ততক্ষণ পড়ে পড়ে কাঁদুক্। খানিকটা কাঁদলেই ও আপনা থেকেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সেই ব্যবস্থাই হলো।

কিন্তু ছেলেটাকে দিয়ে বাপের মুখাগ্নি করতে গিয়ে সে এক করুণ দৃশ্য! পুরোহিত থেকে আরম্ভ করে শ্মশান-যাত্রী সবাইকার চোখে জল এসে গেল।

জ্বলন্ত পলতেটা যখন ছেলের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো, ছেলেটা ভাবলে বুঝি এ এক খেলা। খিল খিল করে হেসে উঠলো ছেলেটা। কিন্তু বাপের মুখের ওপর পল্‌তেটা দিতে গিয়েই হলো বিপদ। জোর করে মুখখানা তার অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল যদিও, তবু সে তার বাপের মুখখানা দেখতে পেলে। দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে সে কোল থেকে নামতে চাইলে। যাবে সে তার বাবার কাছে।

কিন্তু তার কাজ তখন কোনোরকমে শেষ হয়ে গেছে।

পুরোহিত বললে—তোলো।

মেয়েটাকে বললে—পালা তুই ছেলেটাকে নিয়ে।

পালাবে কি, মেয়েটার চোখে তখন শত-ধারা বইছে। না পারছে চোখ মুছতে, না পারছে ছেলেটাকে সাম্‌লাতে। কান্নায় গলাটা বন্ধ হয়ে আসছে, ঠোঁট দুটি থর্ থর্ করে কাঁপছে।

ছেলে কিন্তু তার বাপের দিকে তাকিয়ে। খাটের উপর শুইয়ে কয়েকজন লোক তার বাবাকে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। একদৃষ্টে দেখছে আর ডাকছে—বাবা! বাবা!

বাড়ি ফেরার আগে স্নান করতে হয়।

মেয়েটি অতি কষ্টে ছেলেকে নিয়ে একটা ফাঁকা পুকুরের ঘাটে নিয়ে নামলো। জলে নামতে পেয়ে ছেলেটা বোধকরি তার বাবাকে ভুলে গেল।

মেয়েটি নিজে স্নান করলে, ছেলেকে স্নান করালে। তারপর নিজের কাপড়ের আঁচলটা নিঙ্‌ড়ে ছেলের গা মাথা মুছিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

ওদের বাড়িতে আর ঢুকল না। ওর মা হয়ত এখনও কাঁদছে। কাঁদুক্। এই সময় ছেলেটাকে কিছু খাইয়ে দেওয়া উচিত।

ছেলেটাকে দুধ খাওয়ালে, মুড়ি খাওয়ালে।

তারপর তার মার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে বাড়িতে ঢুকেই যে দৃশ্য সে দেখলে, তা যেমন অভাবনীয়, তেমনি মর্মান্তিক।

দেখলে, ঘরের চৌকাঠের কাছে ছেলের মা তখন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। গায়ের কাপড় গেছে খুলে, ধুলোয় বালিতে জট্-পাকানো মাথার চুলে মুখখানা ঢাকা! গোঁ গোঁ করে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক শব্দ করছে।

ছেলেটা এতক্ষণ পরে কাঁদতে লাগলো তার মার কাছে যাবার জন্যে।

মেয়েটি ছুটে গিয়ে পাড়ার মেয়েদের ডেকে আনলে।—'তোমরা একবারটি এসো চট্ করে। একা আমি সাম্‌লাতে পারছি না।'

মেয়েরা এলো, ছেলেরা এলো।

মাধবীর বাবা এলেন। মাধবী এলো।

কেউ যা কখনও কল্পনাও করতে পারেনি, ছেলের মা ঠিক-তাই করে বসেছে। একটা পাথরের বাটিতে আফিং গুলে খেয়ে ফেলেছে।

মুখ দিয়ে তখন তার ফেনা গড়াচ্ছিল। চোখ দুটো লাল। মুখের গোঙানি স্তিমিত হয়ে এসেছে। ডাকলে সাড়া দেয় না। তুলে বসাতে গেলে উল্টে পড়ে যায়।

চেষ্টা করা হলো অনেক। পল্লীগ্রামে যতটুকু সম্ভব—ততটুকু হলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফল কিছু হলো না।

হতভাগী মরে গেল।

সব যন্ত্রণা তার জুড়িয়ে গেল সত্যি, কিন্তু অমন ছেলে ফেলে মা যে কেমন করে চলে যেতে পারে—এই রহস্যের কেউ কিছু কূল-কিনারা করতে পারলে না।

মাধবীর বাবা বললেন—ছেলেটা কাছে যদি থাকতো, তাহলে বোধহয় মরতে পারতো না। আমারই ভুল হলো—ছেলেটাকে সরিয়ে দেওয়া।

কে একজন জিজ্ঞাসা করলে, এখন ছেলেটার কি হবে?

—কী আর হবে! মাধবীর বাবা বললেন, আমিই নিয়ে যাব।

এই বলে তিনি ডাকলেন, মাধবী!

মাধবী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। এগিয়ে এসে বললে, কি বলছো বাবা?

—ছেলেটাকে বাড়িতে নিয়ে যা।

মাধবী খুশী হলো। খেলার একটা সঙ্গী হলো তার। তক্ষুনি সে তাকে কোলে তুলে নিলে।

বাবা বললেন—পারবি তো নিয়ে যেতে?

মাধবী বললে—খুব পারব।

সুষমা বললে—এই ছেলেটিই সুহাস।

অজিত বললে—বুঝেছি।

সুষমা বললে—স্ত্রীর মৃত্যুর পর মাধবীর বাবা তাঁর দেশের বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে কাশীতে এলেন তাঁর একমাত্র বিধবা কন্যাটিকে নিয়ে, সঙ্গে এলো সুহাস।

সুহাস তখন তাঁর নিজের ছেলের মত।

সবাইকে বললেন—এইটি আমার ছেলে, আর এইটি আমার মেয়ে।

কাশীতে এসে মাধবীর বাবা একদিকে চেষ্টা করতে লাগলেন মাধবীর বিয়ে দেবার, আর একদিকে কিনতে লাগলেন বাড়ি ঘর, বিষয় সম্পত্তি। অর্ধেক সুহাসের নামে, অর্ধেক মাধবীর নামে।

বলতেন—সুহাসকে ছেলের মত নিয়েছি যখন তখন ওকে ছেলের মতই রাখবো।

সুহাস মাধবীর চেয়ে বছর-পাঁচেকের ছোট।

প্রিয়দর্শন বলিষ্ঠ চেহারা সুহাসের। মাধবীর পাশে দাঁড়ালে তাদের এই বয়সের তফাৎটা চট্ করে চোখে ধরা পড়ে না। একটু ভাল করে দেখতে হয়।

অজিত বললে—আজীবন সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবার এই অদ্ভুত বাসনা মাধবীর হলো কেন—তুমি জানো?

সুষমা বললে—জিজ্ঞাসা করেছিলাম। খালি হাসে। বলতে চায় না কিছুতেই।

—সুহাসকেই হয়ত তলায় তলায় ভালবেসেছে, এমনও তো হতে পারে!

—হতে সবই পারে, কিন্তু হয়নি। হলে আমি নিশ্চয় বুঝতে পারতাম।

অজিত মুখ টিপে একটু হেসে বললে—তা পারতে।

সুষমাও হাসলে। হেসে তার গলাটা একটু নামিয়ে বললে, মাধবীকে জিজ্ঞাসাও একদিন করেছিলাম। স্পষ্ট পরিষ্কার করে নয়। একটুখানি ঘুরিয়ে। মাধবী সেদিক দিয়ে খুব চালাক মেয়ে। বুঝতে পেরেছিল। বলেছিল, বিয়ে আমি যখন কিছুতেই করতে চাইলাম না, আমার বাবাও তখন এই সন্দেহই করেছিল। বয়সের তফাৎটা ছোটবেলা যেমন ধরা পড়ে, বড় হলে সেটা আর তেমন ধরা যায় না। বাবা ভেবেছিলেন, ওকেই আমি বিয়ে করতে চাই, কিন্তু একে ও বয়সে ছোট, তার ওপর দিদি বলে ডাকে—তাই বোধহয় লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারছি না। মাধবীর বাবাও মুখ ফুটে মেয়ের কাছে পরিষ্কার করে কিছু বলতে না পারলেও মৃত্যুর আগে একদিন বলেছিলেন, বয়সের কম-বেশীতে কিছু এসে যায় না। মন যদি চায় তো আমি কিছুতেই বাধা দেবো না।

অজিত খানিকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলে। তারপর বললে—সুহাসের সঙ্গেই জয়ার বিয়ে ধরো হয়ে গেল, কিন্তু তার পরের কথাটা ভেবে দেখেছো ?

সুষমা বললে—ওদের বিয়ের কথাটাই ভাবিনি, তার আবার পরের কথা কি ভাববো ?

—এখন ভাবো। তুমি সধবা নও, কপালে তোমার সিঁদুর নেই যে আমাকে তোমার স্বামী বলে চালিয়ে দেবে। আর এসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে চালিয়ে দেওয়াও অন্যায়। পরে যখন সত্য কথা জানাজানি হয়ে যাবে তখন আর কেলেঙ্কারীর বাকি কিছু থাকবে না। তার চেয়ে সুহাসকে সব কথা খুলে বলাই ভাল।

সুষমা যেন চমকে উঠলো।—কি কথা ? তোমার আমার—

কথাটা আর শেষ করতে পারলে না সুষমা।

অজিত বললে—সুহাস কখন আসবে তোমাকে কিছু বলে গেছে ?

সুষমা বললে—না। কিন্তু ছাখো, সুহাসকে এ-কথা তুমি বলতে পারবে না।

—কেন?

—বললে সে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে ভেবেছ? কখ্খনো করবে না।

—না বললেও অন্যায় হবে।

সুষমা বললে—তার চেয়ে তুমি একটি কাজ কর। জয়াকে সে বিয়ে করতে চায় কিনা সেই কথাটা সুহাসকে জিজ্ঞাসা কর।

অজিত বললে—চাইবে বিয়ে করতে। আমি বলছি তোমাকে।

সুষমা বললে—তাহলে বিয়েটা হয়ে যাক।

—তুমি ভুল বলছো সুষমা।

—না। ভুল আমি বলিনি।

—আমার পরিচয় কি দেবে? অজিত জিজ্ঞাসা করলে।

—বলবো দেশের লোক। আমাদের সঙ্গে এসেছেন।

—এই মিথ্যা দিয়ে কতদিন চেপে রাখবে আমাদের সত্য পরিচয়?

সুষমা বললে—সেইজন্যেই তো বলছি—তুমি আমাকে বিয়ে কর। এরকম ঘটনা তো শুনি অন্য দেশে প্রায়ই হয়।

অজিত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে—এ-দেশটা সে-দেশ নয় এই যা ছুঃখু।

তারপর হেসে বললে—আমাদের বিয়েটা তাহলে কখন হচ্ছে?

—জানি না, যাও। বলে সুষমা আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। অজিত বললে—মন্দ নয়। মেয়ের বিয়ের পর হবে মায়ের বিয়ে। এখন বুঝছি—কাজটা ভাল হয়নি! জয়ার মুখের দিকে আমাদের তাকানো উচিত ছিল।

আট

সেদিন সন্ধ্যার আগেই সুহাস এলো।

তার গলার আওয়াজ পেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুষমা। গিয়েই দেখে, সুহাস একা নয়, সঙ্গে মাধবী।

—ওমা, আমার কী সৌভাগ্য! এসো এসো মাধবী এসো!

ওদিকে অজিত ডাকলে, সুহাস এসো!

সুহাস ঢুকলো অজিতের ঘরে, আর মাধবী গেল সুষমার কাছে।

ঘরে ঢুকবার আগে সুষমা ডাকলে, জয়া!

জয়া দাঁড়ালো বারান্দায় রেলিংএর কাছে। সুষমা তার চোখে চোখে কি যে বললে কেউ শুনলে না, অথচ জয়া ঠিক বুঝতে পারলে। বুঝতে পেরেই হাসতে হাসতে সরে গেল।

কিন্তু মাধবীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

মাধবী বললে—মায়ে-ঝিয়ে চোখে চোখে কিসের ইসারা হলো আমি জানি। দ্যাখ্, জয়া, শুধু চা তৈরী করবি, আর কিছু করিস্‌নি। চা নিয়ে আয় আমাদের কাছে। তোর সঙ্গেও আমার কথা আছে।

—ওর সঙ্গে আবার কথা কিসের? সুষমা জিজ্ঞাসা করলে মাধবীকে।

মাধবী বললে—চল, ঘরে চল—বলছি।

মাধবী আর সুষমা—দুজনে দুজনকে কখনও বলে 'তুই', কখনও বলে 'তুমি'।

সুষমা হাসতে হাসতে বললে, পুলিশের মতন যে রকম রু-রু করে এলি, আমার ভয় করছে। বল্ আগে জয়ার সঙ্গে কী দরকার আছে তোর—সেই কথাটা আগে বল্।

—বলছি, বলছি। তুই আগে বল্—উনি কে? ওই যিনি সুহাসকে ডেকে নিয়ে গেলেন ঘরের ভেতর!

ছ্যাঁৎ করে উঠলো সুষমার বুকের ভেতরটা। সর্বনাশ! অজিতের পরিচয়টা আগে চায় কেন?

কিন্তু অত সহজে ভয় পাবার মেয়ে সুষমা নয়। বললে, ও কেউ নয়। আমাদের গ্রামের লোক। একা আসবো মেয়েটাকে নিয়ে—তাই ওকে সঙ্গে এনেছি। আবার চলে যাবে দেশে।

কথা বলবার ঝোঁকে সুষমা বলে ফেললে, 'আবার চলে যাবে দেশে।'

যাই হোক, মাধবী কথাটাকে তেমন আমলই দিলে না। সুষমা নিশ্চিন্ত হলো।

মাধবী বললে, যে কথাটা তোকে আজ আমি বলতে এলাম, বলি শোন্। মেয়ের বিয়ের জন্যে তো ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিলি, এত বড় বাড়িটা নিয়ে বসে আছিস কেন? ভাড়া কত?

—তিরিশ টাকা।

মাধবী বললে—মা আর মেয়ে—এই তো তোর সংসার। ওই ভদ্রলোক তো বলছিস চলে যাবেন। তাহলে মাসে মাসে তিরিশটে টাকাই বা দিবি কেন? পাবি কোথায়?

সুষমা বললে—তা কি করবো তাই বল্?

মাধবী বললে—দেশে তো তোর বাড়ি ঘর দোর আছে বলছিস্। মেয়ের বিয়েটা এইখানে দিয়ে দেশে চলে যা।

সুষমা বললে—খুব উপদেশ দিলি তো দেখছি!

—কেন? পছন্দ হলো না কথাটা?

—না। সুষমা জোর করে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে—না, না, না। দেশে আমি আর যাব না।

মাধবী বললে—দেশে যাবি না তো মর এইখানে। মেয়ের বিয়ে

দিয়ে তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে, এই রূপ নিয়ে একা একা থাক এই কাশীর মতন সর্বনেশে জায়গায়। ব্যাটাছেলেগুলো যখন পেছনে লাগবে তখন বুঝবি মজা! তখন কে তোকে রক্ষা করবে?

—ভগবান রক্ষা করবে।

মাধবী মুচকি মুচকি হাসছিল অনেকক্ষণ থেকে। কথা বলছিল আর হাসছিল।

সুষমা বললে—হাসছিস যে?

মাধবী তার দুই কাঁধে দুই হাত রেখে সুষমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললে—তোর এই রূপ দেখে ভগবানেরও নররূপ ধারণ করতে ইচ্ছা করবে।

সুষমা বললে—যাঃ! তুই নিজে থাকিস কেমন করে? আমার তো তবু একটা মেয়ে আছে, তোর যে আবার তাও নেই!

—আমার কথা ছেড়ে দে!

—ছেড়ে দেবো কেন? তুই বুঝি আমার চেয়ে কম সুন্দরী?

—আমি সুন্দরী? এই বলে হো-হো করে হেসে উঠলো মাধবী।

মাধবীর হাসির মধ্যে কেমন যেন একটি প্রশান্ত পবিত্রতা আছে। আর সুষমা কেমন যেন একটুখানি উগ্র। দুটি মেয়ে দুরকমের। মাধবী তার হাসি থামিয়ে বললে—আমি যে কেমন করে থাকি তা কি তুই জানিস নে সুষমা? একসঙ্গে কিছুদিন তো থেকে এলি!

সুষমা বললে—ঠাকুর-দেবতা? চোখ বুজে ধ্যান করা? আমি ভাই অনেক করে দেখেছি। মন কিছুতেই ঠিক করতে পারি না। খালি খালি মনে হয়—নিজেকে যেন নিজেই ঠকাচ্ছি।

মাধবী বললে—আমার কাছে মন্ত্র নিবি। আমি তোর মনটাকে ঠিক করে দেবো।

—বেশ, তাহলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তোর কাছে গিয়ে থাকবো। তোর একটা বোঝা বাড়বে।

মাধবী বললে—তাহলে এই কথা রইলো।

—কি কথা ?

—মেয়ের বিয়ে দিয়ে তুই আমার কাছে গিয়ে থাকবি।

জবাব দিতে গিয়ে সুষমার মুখখানি যেন একটু ম্লান হয়ে গেল। ভাবলে, অজিতের কি হবে তাহলে ?

সুষমা বললে—বেশ তো। কিন্তু মেয়ের বিয়েটা আগে হোক। এক হাজার টাকা না হয় পেয়েছি, ছেলে কোথায় ?

মাধবী বল্লে—টাকা দিয়েছি, ছেলেও আমি দিচ্ছি।

এই বলে সে সুহাসের কথা বললে।

বললে—সুহাসের সঙ্গে জয়ার বিয়ে দে।

অজিত যে তাকে সেই কথাই বলেছে, তাদেরও যে এই নিয়েই কথা হচ্ছিল—সুষমা সেকথা বললে না মাধবীকে। শুধু বললে—সে ভাগ্য কি আমার হবে ? সুহাস কি বিয়ে করবে জয়াকে ?

মাধবী বললে—তোমার মেয়েটি কম নয়। সে-ই গেঁথেছে সুহাসকে।

—কেমন করে জানলি ?

মাধবী বললে—সুহাসই তো আমাকে টেনে আনলে এখানে। বললে—তুই চল্ দিদি, আমার লজ্জা করছে বল্লতে।

সুষমা বললে—কেমন করে কি হবে রে ? আমার হাতে তো সেই ওরই দেওয়া হাজারটি টাকা।

মাধবী বললে—ছেলে নিজে যেচে এসে বিয়ে করছে, তোর আবার খরচ কিসের ? দাঁড়া ডাকি সুহাসকে।

এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে ডাকলে, সুহাস !

সাড়া পেলে না।

আবার ডাকলে।

এবারেও সাড়া না পেয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়েই দেখতে

পেলে—জয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপটি করে। মাধবী তাকে কাছে ডাকলে।

তা মেয়েটা সুন্দরী তাতে কোনও ভুল নেই!

মাধবী জিজ্ঞাসা করলে—সুহাস কোথায় গেল রে?

—দেখবো?

—তুই কোথায় দেখবি?

জয়া বললে—এই তো, এই ঘরে ছিল।

বলেই সে সেই ঘরের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছিল, এমন সময় সিঁড়ির দিকে নজর পড়তেই দেখলে, সুহাস কোথায় যেন গিয়েছিল, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে।

জয়া বললে—ওই তো—

মাধবী জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় গিয়েছিলি?

সুহাস বললে—গিয়েছিলাম এক জায়গায়।

বলেই সে আর সেখানে দাঁড়ালো না, অজিত যে ঘরে ছিল সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মাধবী বললে—সুহাস, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। এই ঘরে আয় একবার!

সুহাস কিন্তু 'যাচ্ছি' বলেও এলো না। অজিতের কাছে বসে গল্প করতে লাগলো।

মাধবী বললে—কী এমন কথা হচ্ছে ওদের দেখি।

বলে সে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুষমা তাকে দিলে না উঠতে।

তার ভয়—পাছে অজিতের সঙ্গে মাধবীর দেখা হয়ে যায়।

সুষমা বললে—থাক আর তোকে উঠতে হবে না। জয়া, যা না, ডাক না সুহাসকে!

আগে হলেও বা লাফাতে লাফাতে জয়া ছুটতো তাকে ডাকতে,

সেদিন কিন্তু তার লজ্জা হলো। মাথা হেঁট করে বললে, তুমি ডাকো না মা, ডাকলেই আসবে।

তোরা বোস তাহলে আমিই যাচ্ছি।

সুষমা নিজেই গেল অজিতের ঘরে।

গিয়ে দেখে দুজনে বসে বসে বোধ করি বা বিয়ের কথাই বলছে।

সুষমাকে দেখেই অজিত বলে উঠলো, দ্যাখো সুষমা, আমি যা বলেছিলাম তাই ঠিক হলো কি না! সুহাসকে আমি জয়ার সঙ্গে বিয়ের কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, সুহাস তার আগেই বললে—আমি সেই জন্যেই এসেছি। ওর দিদির সঙ্গে কথা হলো?

সুষমা বললে—হলো।

অজিত হাসতে হাসতে বললে—আমরা আরও একটুখানি এগিয়েছি।

সুহাসকে পাঠিয়েছিলাম—তার এক কোন্ চেনা ভটচাজ আছেন এই পাড়ায়—তাঁর কাছে, বিয়ের দিন ঠিক করতে। সুহাস ঠিক করে এসেছে পঁচিশে তারিখে বিয়ে।

সুষমা বললে—এই পঁচিশে? মানে আর চার পাঁচদিন পরে?

অজিত বললে—হ্যাঁ। বড় ভাল ছেলে সুহাস। ওকে আমি সব কথা জিজ্ঞাসা করে নিয়েছি।

সব কথাটা যে কী সেকথা জিজ্ঞাসা করতে সুষমার সাহস হলো না। বিশ্বাস নেই অজিতকে—হয়ত বা তাদের সম্বন্ধের কথাটাও তাকে বলে ফেলতে পারে। তাড়াতাড়ি সুহাসকে সেখান থেকে তুলে আনবার জন্যে সুষমা বললে—এসো সুহাস, মাধবী তোমাকে ডাকছে।

সুহাস উঠে এলো সুষমার সঙ্গে।

মাধবী একটু মজা করলে। সুহাস আসতেই বললে—কি রকম বুদ্ধি বল দেখি তোর! সুষমাকে তুই তার মেয়ের বিয়ের জন্যে টাকা

যোগাড় করে দিলি, তখন কিছু বললি না, ওদের নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এসে এখানে পৌঁছে দিলি, তখনও কিছু বললি না, আর আজ যখন জয়ার বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে অন্য একটি ছেলের সঙ্গে, তখন তুই বলছিস কিনা জয়াকে আমি বিয়ে করবো তুমি সব ব্যবস্থা করে দাও দিদি। আমি এখন কি করি বল দেখি ?

সুহাসের মুখখানি শুকিয়ে গেল। বললে—কিন্তু তখন তো জয়ার মা কিছু বললেন না !

এই বলে একবার সে সুষমার মুখের দিকে, একবার জয়ার মুখের দিকে তাকালে।

সুষমা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, মুখ টিপে হাসিটা বন্ধ করবার জন্যে। কাজেই সুহাস ঠিক বুঝতে পারলে না তাঁর মনের ভাবটা কি ! কিন্তু বিপদে পড়ল জয়া। মাধবী তাকে তার কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসেছিল। না পারলে মুখ লুকোতে, না পারলে হাসি চাপতে। কিন্তু চালাক মেয়ে, হাসিটা সুহাস পাছে দেখতে পায় তাই সে চট করে মাধবীর বুকে তার মুখখানা গুঁজে দিলে।

হাসি চাপবার জন্যেই যে সে মুখ লুকিয়েছে মাধবীর বুঝতে দেরি হলো না। তক্ষুনি হাত বাড়িয়ে জয়াকে জড়িয়ে ধরে বললে—বুঝেছি তোর কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি করবি বল। সুহাসকে তো বলছি সেই কথা। আগে সে আমাকে বললে না কেন ? তুইও তো বলতে পারতিস। আমাকে বলতে না পারিস তোর মাকে বললেও তো হতো !

হঠাৎ মনে হলো জয়ার সর্বশরীর যেন কাঁপছে। খিঁক খিঁক করে চাপা হাসির একটা আওয়াজও যেন কানে এলো সুহাসের।

সুহাস তখন এগিয়ে এলো মাধবীর কাছে। বললে—ছাখ দিদি, কন্যাদায় বলে একহাজার টাকা যে দেওয়া হয়েছে জয়ার মার হাতে, সেটা কি তোরা ভেবেছিস আমাদের দরিদ্র-ভাণ্ডার থেকে দেওয়া

হয়েছে? লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে ক্লাবের ছেলেরা কত যোগাড় করেছিল জানিস? সাতাত্তোর টাকা বারো আনা। বাকি টাকা আমি দিয়েছি। কেন, জয়া তো জানে সেকথা!

—হ্যাঁরে, তুই জানিস?

মাধবী মাথা হেঁট করে জয়াকে জিজ্ঞাসা করলে।

কিন্তু তখনও তেমনি মাধবীর বুকে মাথা গুঁজে ঘাড় নেড়ে জয়া কি যে জবাব দিলে ঠিক বোঝা গেল না।

সুহাস বললে—দ্যাখ দিদি, তুই এক কাজ কর। কাশীতে বসে শুধু ভগবান ভগবান করে তোর অমূল্য জীবন তুই নষ্ট করছিস কেন? চল্ তোকে কলকাতায় নিয়ে যাই। সিনেমা কোম্পানিতে আজকাল ফিমেল আর্টিস্টের চাহিদা খুব। তোকে পেলে তারা লুফে নেবে। অভিনয় করে লাখ লাখ টাকা রোজগার করতে পারবি। অমুক হিরোইনের ভাই বলে আমরাও লোকের কাছে পরিচয় দিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারবো।

রসিকতাটা বুঝতে মাধবীর দেরি হলো না। বললে—তুই কি ভেবেছিস আমি অভিনয় করছি তোর সঙ্গে?

সুহাস বললে—আমার সঙ্গে তো চিরকাল অভিনয় করে এসেছিস, আজ কি নতুন নাকি?

এবার মাধবী হেসে ফেললে। ফট্ করে জয়ার পিঠে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললে—এই মেয়েটি যত নষ্টের গোড়া! দিলে ফিক ফিক করে হেসে! নে ওঠ আর মুখ লুকিয়ে থাকতে হয় না।

জয়া হাসতে হাসতে মুখ তুললে, সুষমা হাসতে লাগলো, মাধবী হাসল। বললে—ধন্যি ছেলে বাবা! এই মেয়েটাকে তোর এত ভাল লাগলো? কতবার বলেছি—সুহাস বিয়ে কর, সুহাস বিয়ে কর! না দিদি বিয়ে আমি করবো না। একা একা বেশ আছি।

সুহাস বললে—যাকে তাকে বিয়ে অমনি করলেই হলো! কেন,

তোকেও তো বিয়ের জন্যে সাধাসাধি করা হয়েছে কত! তুই বিয়ে করলি না কেন?

মাধবী বললে—আমি যে বিধবা রে!

—যা যাঃ! বিধবা! বিয়ে তোর হলো কখন যে তুই বিধবা হলি!

বলেই সে কথাটা পালটে নিলে। বললে—তাহলে ওই ঠিক রইলো আসছে পঁচিশে তারিখে বিয়ে।

মাধবী জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ে কি এই বাড়ি থেকেই হবে?

সুহাস বললে—প্রথমে ভেবেছিলাম, তোর বাড়িটা হবে কনের বাড়ি আর আমার বাড়িটা বরের বাড়ি। তারপর আবার ভাবলাম, না। আমাদের পাশাপাশি বাড়ি। বিয়ে বিয়ে মনেই হবে না। তার চেয়ে দিব্যি কেমন পালকি চড়ে বিয়ে করতে আসবো, ক্লাবের জন দশেক ছেলে আসবে বরযাত্রী। বেশ হবে কিন্তু। তুই আমাকে সাজিয়ে দিবি তো ভাল করে?

মাধবী বললে—তা না হয় দেবো, কিন্তু একটি কথা শুনে রাখ। তোর শাশুড়ীর একটি পয়সা নেই। তোকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে আমি জানি। সুহাস বললে—আজই আমি আমাদের ক্লাবের ছেলেদের জানিয়ে দেবো। এ বাড়ির ও বাড়ির সব বাড়ির ব্যবস্থাই তারা করবে। কিন্তু দ্যাখ, বিয়েতে বেশী খরচ করিয়ে দিসনে আমাকে। বিয়ের পর আমার অনেক খরচ আছে।

মাধবী বললে—তোর আবার খরচ কিসের?

সুহাস বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, খরচ আছে।

—বল না কিসের খরচ? বউকে নিয়ে খুব ঘুরে বেড়াবি। এই তো?

—না না ঘুরে বেড়াব না। সে খরচ নয়।

—তবে কি খুব ঘটা করে বউভাত করবি ?

—না না তাতে আর কত খরচ হবে ?

—তবে ?

সুহাস প্রথমে বলতে চাইছিল না।—কিছু না কিছু না, তুই থাম।

মাধবী ধরে বসলো।—না থামবো না, তোকে বলতেই হবে।

সুহাস তখন জয়ার দিকে তাকিয়ে বললে—ওই তো তোর কাছেই বসে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না—ওর গায়ে একটা গয়না আছে ?

মাধবী হো হো করে হেসে উঠলো।

সুহাস তাকে ভেংচি কেটে বললে—হ্যা হ্যা করে হাসিসনি মাধবী, শোন। বিয়ের দিন গয়নাগুলো ওকে পরিয়ে দিবি।

মাধবী বললে—যাক বাবা, এতদিন পরে একটা খদ্দের পেলাম। আমি তো পরি না গয়নাগুলো, সব ভরাই আছে। তুই আমাকে টাকা দিস তো তোর বউকে সব বেচে দিতে পারি।

সুহাস বললে—কমসম করে নিস তো দেবো।

মাধবী চোখ মটকে বললে—কিপটে কোথাকার! কেপ্পনের একশেষ!

বিনা পয়সায় অমন সুন্দর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, সুষমার মনে আনন্দ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে বুকের ভেতরটা তার সব সময়েই ঢিপ ঢিপ করছে ভয়ে। ঢিপ ঢিপ করছে লজ্জায়!

অজিতের কথাটা ঘুণাক্ষরেও কেউ যদি জানতে পারে তো সব যাবে নষ্ট হয়ে।

তার চেয়ে বিয়ের কটা দিন অজিতকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়াই ভালো।

মাধবী আর সুহাস সেদিন চলে যাওয়ার পরেই সুষমা ঢুকলো অজিতের ঘরে। বললে—আলাদাই তোমাকে থাকতে হবে দেখছি।

অজিত বললে—থাকবো।

সুষমা বললে—কিন্তু আমি যে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

অজিত বললে—কয়েকটা দিন আমি অনিলবাবুর স্টুডিওতে থাকবো। তারপর বিয়েটা চুকে যাবার পর যাহোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

সুষমা বললে—বিয়েতে খরচ যখন কিছু হলোই না, তখন সেই হাজার টাকার থেকে তোমাকে আমি কিছু টাকা দিই, তুমি ক্যামেরা কিনে ফটো তোলার একটা দোকান কর। জয়ার বিয়ের পর এতবড় বাড়ি তো রাখবো না। ছোট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে—

—সুহাস যদি তোমাকে একা থাকতে না দেয়? যদি বলে আপনি আমার কাছে এসে থাকুন?

সুষমা বললে—থাকবো না কিছুতেই। তখন গ্রামে যাচ্ছি বলে আমরা অন্য কোথাও চলে যাব।

নয়

সূর্যগ্রহণের সময় কাশী গিয়ে নন্দ চক্রবর্তী ভিড়ের মধ্যে একবার অজিতকে দেখেছিল—কথাটা সে গ্রামে গিয়ে রাষ্ট্র করে দিল।

কথাটা শুনেই ইন্দুমতী তার বাড়ি গিয়ে হাজির।

নন্দ বললে, হ্যাঁগো বউমা, আমি দেখলাম। আমি মিছে কথা বলব না।

—কোথায় দেখলে ?

—যে রাস্তা ধরে গঙ্গায় যেতে হয় সেই রাস্তায় লোকের ভিড়ের মাঝখানে দেখেছিলাম।

—পেছনে পেছনে গেলে না কেন ?

—কি করে যাব ? ভিড়ের মধ্যে তার পাত্তাই পেলাম না আমি। কোথায় যে মিলিয়ে গেল।

—না, মিলিয়ে যায়নি, তোমাকে দেখেই সে গা-ঢাকা দিয়েছে।

আর বেশী কথা না বলে ইন্দুমতী বাড়ি ফিরে এসে দেখলে তার দাদা তক্তপোশের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

ইন্দুমতী বললে, মরণ আর কি। সময় নেই অসময় নেই, নাক ডাকাচ্ছে ছ্যাখো ! বলি ও দাদা, দাদা !

ডাক শুনে চোখ মেলে তাকিয়ে তার দাদা বললে—আমায় ডাকছিস্ ইন্দু ?

—হ্যাঁ, ডাকছি, ওঠো, চলো—আজ রাত্রেই কাশী যেতে হবে।

বীরেন যেন আকাশ থেকে পড়ল। বললে,—কাশী ? বারাণসী ? কেন ?

ইন্দুমতী বললে, সন্ধান পাওয়া গেল। ছুঁড়ীকে নিয়ে ও কাশী গেছে। চল—ওঠো। আমি এদিককার সব ঠিকঠাক করি।

—কি সর্বনাশ! দীজু বাগ্দীর কাছে সবে সে ডুগিতবলা বাজানো শিখছে, সবটুকু এখনও আয়ত্ত হয়নি—আর এই সময়েই কিনা—চল কাশী! বললে, দাঁড়া না, আরে দুদিন সবুর কর। গিয়েছে যখন, তখন ফিরবেই।

ইন্দুমতী রেগে উঠলো—তোমার মাথা করবে! চল। আজই যেতে হবে!

—কিন্তু ফাঁকা বাড়ি—

—বাড়ি আগলাবার ব্যবস্থা আমি করছি।

—বেশ, চল্ তবে।

কিন্তু বাড়ি আগলাবার লোক সহজে মিললো না। ইন্দুমতীকে সবাই চেনে—তাই সে-গুরুভার নিতে কেউ রাজী হলো না।

ফিরে এসে ইন্দুমতী বললে, না দাদা, আজকে থাক, কালকেই যাওয়া যাবে।

বীরেন বললে—আচ্ছা।

বলেই সে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

ইন্দুমতী বললে, কাশী তুই কখনও গেছিস্ দাদা?

—না।

—তাহলে?

—লোককে জিজ্ঞাসা করে করেই মেরে দেব। জিজ্ঞাসা করে করে লোকে বর্ধমান বীরভূম মেরে দিচ্ছে, আর এ তো সামান্য কাশী!

বীরেনের কথা বলার ধরনই আলাদা। এত দুঃখেও ইন্দুমতী হাসতে লাগলো।

দশ

পাড়া-পড়শী কেউ যখন ইন্দুমতীর বাড়ি আগলাতে রাজী হলো না, তখন সে অগত্যা বাগ্‌দী-পাড়ায় গিয়ে সন্ধান করতে লাগল।

কয়েকদিন পরে জন-দুই বাগ্‌দী-ছোকরাকে রাজী করিয়ে ইন্দুমতী বললে—গরু-বাছুরের সেবা-যত্ন করবি, দু'সের করে দুধের মধ্যে এক সের দিবি ভট্‌চাজ গিন্নীকে, ওর মাসকাবারী রোজ আছে। আর বাকি এক সের তোরা দুজনে খাবি না হয় বাপু, কি আর করব বল।

বীরেনের তখন নিজেরই বুকে পায়ে তক্তপোশে দেয়ালে যখন-তখন যেখানে-সেখানে গুঁক্ গুঁক্ করে ডুগি-তবলার বোল অভ্যাস চলছে—নেহাত না গেলে নয় বলেই যাওয়া! জিজ্ঞাসা করলে, কতগুলি টাকা সঙ্গে নিলি বল তো ইন্দু?

ইন্দুমতী বললে—কত নেবো বল দেখি দাদা?

খানিক ভেবে বীরেন বললে, তা বিদেশ-বিভূঁই জায়গা, তাছাড়া দেখবার-শোনবারও অনেক জিনিস আছে শুনেছি—তা শ'খানেকের কম তো নয়।

কত বললি, শ' খানেক? এক শ'!

—হ্যাঁ, এক শ'!

ইন্দুমতী চোখ দুটো বড় করে বললে—একশ! বা-বাঃ কাজ নেই, রইলো আমার যাওয়া। একশ-টাকা খরচ করে সেই মিনসেকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে? ভারি তো গরজ! নাই বা এলো। না এলো তো আমার বয়ে গেল। আজই ওই বাগ্‌দীদের ছোঁড়া দুটোকে তাহলে বারণ করে দিয়ে আসি!

বীরেন বললে, সেই ভাল। আপনিই আসবে, দেখিস্।

ইন্দুমতী তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে—না দাদা, তা আসবে না। তাকে তুমি চেনো না। মায়া দয়া বলে কোনও পদার্থ নেই। তা না আসুক গে। এক শ' টাকা খরচ করলে মেয়েটার বিয়ে দেওয়া হবে।

বীরেন চুপ করে রইলো। ইন্দুমতী বললে, পঞ্চাশটি টাকা যোগাড় করেছি, বলিস্ তো চাল-ধান বেচে আরও কিছু যোগাড় করতে পারি। এই টাকায় হয় তো হবে—না হয় না হবে।

বীরেন ঘাড় নেড়ে বললে, হবে না।

—তবে না হোক গে। মরুক সে ওই ছুঁড়ীকে নিয়ে ওইখানেই স্বর্গবাস করুক। এই বলে ইন্দুমতী অন্যত্র চলে গেল।

কিন্তু তার পরের দিন বিকেলে ইন্দুমতীই যে আবার কেমন করে মত পালটালো কে জানে। কোথায় যেন সে গিয়েছিল, গজগজ করে বকতে বকতে বাড়ি ফিরে বীরেনকে বললে—জামা-কাপড় তোর দেখছি ময়লা হয়েছে দাদা, দে তবে জামা-কাপড়ে দিই এক হাত সাবান বুলিয়ে।

বীরেন বললে—আজ আর এ অসময়ে কেন, কাল দিলেই হবে।

ইন্দুমতী বললে—কাল কি আর দেবার আমার অবসর থাকবে? ভট্চাজকে দিন দেখিয়ে এলাম। বললে—কালকেই দিনটি বেশ ভাল দিন। যেতে হয় তো কাল যাওয়াই ভাল।

বীরেন জিজ্ঞাসা করলে—আবার কি যাবার ঠিক হলো নাকি?

—তা আর আমি কি করব বল দাদা, ইন্দুমতী বললে—ভট্চাজদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। ভট্চাজ-গিন্নীর কাছে দুধের দাম পাই, ভাবলাম চেয়ে আনি। আমার কথাবার্তা সব শুনে বললে, তোর ওই সোনার তাবিজ-জোড়াটা যাক্গে, তোর কাছে ও-সব কথা বলে

আর কি হবে। যথাসর্বস্ব খুইয়ে চল্ একবার দেখেই আসি! আমারই তো গরজ! ওর আর কি বল্!

ছুদিন পরে ইন্দুমতী তার ছেলে ও মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কাশী যাবার জন্যে একটি গরুর গাড়িতে গিয়ে উঠলো। রেল-স্টেশন বেশী দূরে নয়। বীরেন বললে, আমি চড়ব না। আমি আগে গিয়ে টিকিট করি।

ইন্দুমতী আর কোনও কথা বলছে না দেখে বীরেন গাড়ির কাছে এগিয়ে এলো। হাত পেতে বললো, টাকাকড়ি তোর কাছে রাখিস্‌নে ইন্দু, দে আমার হাতে, আমি রেখে দিই। কাশীতে আবার গুণ্ডা আছে শুনেছি।

নিজের কাছে কিছু রেখে দশটাকার দশখানি নোট কোমরে জড়ানো আঁচলের খুঁট থেকে খুলে ইন্দুমতী তার দাদার হাতে তুলে দিয়ে বললে, পেট-আঁচলে ভাল করে বেঁধে রাখ্ দাদা, পকেটে রাখিসনি।

এগারো

জিজ্ঞাসা করে করে কাশী পৌঁছে তারা এক যাত্রিনিবাসে গিয়ে উঠলো।

বীরেন বলেছিল, রান্নার হাঙ্গামা আর করিসনি ইন্দু, হোটেল থেকে খাবার কিনে এনে খেলেই চলবে। তা নইলে অজিতকে আমরা খোঁজাখুঁজিই বা করব কখন, আর ঘুরে ঘুরে সব দেখেই বা বেড়াব কখন ?

কিন্তু ইন্দুমতী রাজী হয়নি। হোটেলে কে না কে রান্না করে তাদের জাতের ঠিক নেই। সেখান থেকে ভাত কিনে এনে খাওয়া চলবে না। নিজেই সে রান্না করবে।

ইন্দুমতী জীবনে এই প্রথম শহর দেখছে। গাড়ি ঘোড়া লোকজন দেখে প্রথমে সে কেমন যেন একটুখানি ভ্যাবাচাকা হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, এর ভেতর থেকে একটা মানুষকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। বললে—না দাদা, মিছেই এলাম। টাকা খরচই সার হবে।

বীরেন বললে—পাগল হয়েছিস ? ছাখ্ না, খুঁজে আমি বের করবই।

কিন্তু অজিতকে খোঁজা দূরের কথা, বিকেলে একবার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সুন্দরী মেয়েদের জনতা দেখে কিজন্যে সে কাশী এসেছে সে কথা তার আর মনেই রইলো না। যতই সন্ধ্যা হতে লাগল, জনতা ততই বাড়তে লাগল। বীরেনের খুশী যেন আর ধরে না। ইন্দুমতীকে বলে,—বাঃ, কেমন শহর দেখেছিস !

ইন্দুমতীর চোখ কিন্তু তখন অজিতকে খুঁজে ফিরছে।

ইন্দুমতীকে পেছনে ফেলে দিয়ে বীরেন মেয়েদের পিছু পিছু ছুটতে থাকে।

ইন্দুমতী বলে—কোথায় যাচ্ছিস্ দাদা, আমরা হারিয়ে যাব যে!

বীরেন তাকে এক ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। বলে—তুই এই গাছের তলায় চুপটি করে বোস্, আমি খুঁজে দেখি।

ইন্দুমতী কিন্তু বসতে চায় না। বলে—না, আর বসব না, চল্।

কিন্তু প্রায়ই যখন সে দেখে বীরেন বারে বারে তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন সে খুব চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করে—অমন করে কাকে দেখছিস দাদা?

—দেখছি সেই মাগীকে, যাকে নিয়ে অজিত পালিয়ে এসেছে।

ইন্দুমতী বলে—তুই তো তাকে চিনিস না দাদা, কেন তুই অমন করে ছুটছিস? আমার সঙ্গে আয় না, আমি ওদের সবাইকে চিনি।

বীরেন বলে—ছাই চিনিস, তোকে সঙ্গে না নিয়ে আমি যদি একলা আসতাম তাহলে বেশ ভাল হতো।

এমনি করে বীরেনের অনুসন্ধান চলতে থাকে।

এত সুন্দরী মেয়ে বীরেন একসঙ্গে কখনো দেখেনি। কোথাও কোনও জায়গায় যদি বা দেখেছে এক আধটা তাদের এমন স্বাধীন ভাবে বেপরোয়া পায়ে হেঁটে চলে ফিরে বেড়াতে দেখেনি। সেরকম দেখার সৌভাগ্য তার এই প্রথম।

তাই সে যাকেই দেখে তাকেই মনে করে এই বুঝি সুষমা—কেমন যেন মনে মনে সে ধারণা করে নিয়েছে যে সুষমা না হোক অন্ততঃ এরা সকলেই সুষমার মত। বলে—দ্যাখ্ ইন্দু, কাশী বড় খারাপ জায়গা। এখানে সবাই অমনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। এই জন্যেই লোকে বলে কাশীর মাটি আর কাশীর বেটী দেশে নিয়ে যেতে নেই।

ইন্দুমতীর মন আর চোখ তখন অন্যদিকে। কথা সে তার কতক শোনে, কতক শোনে না। আন্দাজেই বলে—হুঁ।

বীরেন বলে—তা যদি না হতো, অনায়াসে আমি এখান থেকে একটা বিয়ে করে দেশে বউ নিয়ে যেতে পারতাম।

ইন্দুমতী বললে, হুঁ।

ইন্দুমতীর নজর পুরুষদের দিকে আর বীরেনের নজর মেয়েদের দিকে।

দু তিন দিন ধরে খুঁজে শেষে হয়রান হয়ে গিয়ে ইন্দুমতী বলে—চল্ দাদা, এবারে ফিরে চল্। নন্দ চক্কোত্তি কাকে না কাকে দেখে কি বলেছিল তার ঠিক কি? চল্ এবারে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে ওর মাথাটা খাইগে।

কিন্তু এত শীগ্‌গির ফিরতে বীরেনের ইচ্ছা নেই। বলে, দাঁড়া না, দুদিন দেখি।

ইন্দুমতী বলে—তুই তো খুব দেখছিস। খালি খালি মেয়ে দেখে দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ আর আমি হোঁচট খেয়ে খেয়ে মরছি।

বীরেন একটু লজ্জিত হলো। বললে—মাইরি আর কি। তুই হোঁচট খাচ্ছিস? বেশ, আজকেই তাহলে আমার শেষ দেখা। আজ অজিতকে না পেলে কাল চলে যাব আমরা।

বারো

হয়তো বা সেদিন তারা শেষ-দেখা দেখবার জন্যেই বের হয়েছিল।

পথে যা দেখে বীরেন সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে।

ইন্দুমতী জিজ্ঞাসা করে—দাঁড়ালি যে ?

—দাঁড়া এইটে দেখে নিই।

এমনি করে চলতে চলতে তারা দুজনে একটা ফটো-স্টুডিওর পাশে এসে দাঁড়াল।

এইটিই অনিলবাবুর ফটো-স্টুডিও। বীরেন বললে—ইন্দু, তোর একটা ফটো তোলাবি ?

ইন্দুমতী বললে—আমার আবার ফটক কেনে দাদা ?

—কে কবে মরে যাবে তার ঠিক নেই। ফটো একটা তুলিয়ে রাখা ভাল।

আসলে ফটো তোলাবার ইচ্ছেটা বীরেনের। ইন্দুমতীকে এক-রকম টানতে টানতে সে স্টুডিওর ভেতর গিয়ে ঢুকলো।

পাশের ঘরে অনিলবাবু বোধ করি বসে বসে কার সঙ্গে গল্প করছিলেন।

যে জায়গায় ছবি তোলা হয় বীরেন আর ইন্দুমতীকে কর্মচারী সেই জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসালে।

তারপর যা ঘটলো তা আর বলে কাজ নেই!

কার ফটো তোলা হবে, কি রকম ফটো চাই জানবার জন্যে অনিলবাবুর পেছনে যে লোকটি এসে দাঁড়ালো সে অজিত। তারই সঙ্গে অনিলবাবু এতক্ষণ কথা বলছিলেন।

বীরেন তখন পিছন ফিরে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। ঘরে কে ঢুকল না ঢুকল সে দেখতে পায়নি।

দেখলে ইন্দুমতী। আর দেখেই ফটো তোলার কথা ভুলে গিয়ে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে তার সেই আয়ত তুটি চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে অজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। যে মানুষটির ওপর তার বিদ্বেষের সীমা ছিল না, মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যেন সব কিছু অন্তর্হিত হয়ে গেল। ইন্দুমতীর মুখে এত বড় যে কটু কথা, এত যে গালাগালি তার কোনও চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল না। মনে হলো এই মানুষটিকে যেন সে কখনও দেখেনি। দেখা যেন তার শেষই হয় না।

মেয়েটি 'বাবা' বলে ছুটে গিয়ে অজিতকে জড়িয়ে ধরলে। ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

বীরেন পিছন ফিরে চিরুনি হাতে নিয়েই হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

অনিল বিস্ময়ে হতবাক্।

বললেন—ব্যাপারটা যে বেশ ঘোরালো বলে মনে হচ্ছে অজিতবাবু!

অজিত বললে—ঘোরালোই বটে।

—এরা আপনার কে?

—পরে একসময় আসব আমি। এসে বলব, এখন চলি। এই বলে অজিত তাদের সঙ্গে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গেল।

বীরেন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে বেরুলো স্টুডিও থেকে।

—ধেৎ মাইরি, তুমি ছবিটাও তুলতে দিলে না! কোম্পানির একটা খদ্দের হাত ছাড়া হয়ে গেল।

অজিত বললে—তা হোক্। ফটো আর নাই-বা তুললে!

—না না ফটো থাকা ভাল। বাড়ির দেয়ালে কেমন টাঙানো থাকে। মানুষ মরে টরে গেলে তবু দেখতে পায়।

অজিত অন্য কথা পাড়লে। জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা হঠাৎ কাশীতে এলে কেন? পুণ্যি করতে?

বীরেন বললে—বয়ে গেছে পুণ্যি করতে। কাশী এসেছি তোমাকে পাকড়াও করতে।

—আমি এখানে আছি জানলে কেমন করে?

—তোমাদের গাঁয়ের সেই যে ব্যাটার কি বলে যেন নাম,—সে যে বললে তুমি কাশীতে আছ।

—কিন্তু ফটো তোলাতে গিয়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বলে তাই, দেখা যদি না হতো তো কি করতে?

বীরেন বললে—ফিরে যেতাম। আজকেই তো আমাদের ফিরে যাবার দিন ছিল। টাকার পুঁজি তো মোটে এক শ'।

—কদিন এসেছ?

বীরেন বললে—আজ চারদিন হলো। তাই নারে ইন্দু?

বলে সে ইন্দুমতীর দিকে তাকালে।

ইন্দুমতী একটি কথাও বলছে না। অজিতকে দেখে অবধি সেই যে সে চুপ হয়ে গেছে তার মুখ থেকে একটি কথাও শোনা যাচ্ছে না। দাদার কথার সে জবাব দিলে না।

অজিতের কাছে এ যেন এক বিচিত্র ব্যাপার! সেই ইন্দুমতী। সেই তার মুখরা স্ত্রী, ইন্দুমতী!

ইন্দুমতীর কাছ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে বীরেন আবার বলতে লাগলো—মাঝখান থেকে আমার কাশী দেখা হয়ে গেল। বিশ্বনাথ দেখলাম, অন্নপূন্নো দেখলাম, গঙ্গায় চান করলাম, শুধু ফটোটি তোলা হল না। তুমিই দিলে না তুলতে।

অজিত বললে—দেবো দেবো ফটো তোমার তুলিয়ে দেবো।

বীরেন কিন্তু কথাটা তার বিশ্বাস করতে পারলে না। বললে—আবার কখন তোলাবে? কাজ তো আমাদের হয়ে গেছে।

তোমাকে পেয়েছি, বাস, এবার তোমাকে নিয়ে আমরা চলে যাব এখান থেকে।

কথাটার জবাব দিলে না অজিত।

এত চট করে কী জবাবই বা সে দেবে?

শুধু বললে—আমি কি একটা জিনিস? হারিয়ে গিয়েছিল, কুড়িয়ে পেলে আর চট করে পকেটে পুরে নিয়ে চলে গেলে?

কথাটা বললে অবশ্য সে তার স্ত্রীকে শুনিয়ে শুনিয়ে, কিন্তু স্ত্রী একেবারে নীরব নির্বিকার। এ কি সেই ইন্দুমতী না আর কেউ?

অজিত অবাক হয়ে তার দিকে একবার করে তাকায় আর বলে—তোমাকে আমি বোকা ভাবতাম বীরেন, এখন দেখছি নেহাত বোকা তুমি নও।

প্রশংসা শুনে বীরেন বেশ খুশী হয়ে ওঠে। একগাল হেসে বলে—হেঁঃ, তোমার যেমন কথা!

—না কথা নয় বীরেন, কাশী তুমি কখনও আসনি, আর সেই কাশীর মত অপরিচিত জায়গায় এসে দিব্যি কেমন বাড়ি ঠিক করেছ, খাচ্ছ দাচ্ছ, ঘুরে বেড়াচ্ছ, পুণ্যি করছো—

বীরেন বললে—চল আগে বাড়িখানা ছাখো কি রকম বাড়ি!

অজিত ভেবেছিল, যাত্রী-নিবাস কিংবা ধর্মশালার কোনও একটা নোংরা অপরিষ্কার ঘরে এসে তারা উঠেছে, সেইখানেই চারটি রান্নাবান্না করে পড়ে আছে কোনো রকমে।

কিন্তু গিয়ে দেখলে তা নয়। বাড়িটাকে যাত্রী-নিবাস ঠিক বলা চলে না। বিশ্বনাথ মন্দিরের পেছনের দিকে, অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে ছোট্ট একখানি দাওয়া-উঁচু বাড়ির নীচের একখানি পরিষ্কার ঘর পেয়েছে তারা। ঘরের পাশে একটু রান্নার জায়গা, উঠোনে একটি পেয়ারা গাছ, গাছের নীচে দড়ির একটি খাটিয়া পাতা।

বাড়িতে লোকজন বিশেষ কেউ আছে বলে মনে হল না।

দোতলায় ওঠবার সরু একটা পাথরের সিঁড়ি. আর সেই সিঁড়ির মুখে লোহার সিক দেওয়া সে এক গ্রিলের/দরজায় মোটা একটা তালা ঝুলছে।

বীরেন বললে—রোজ হিসাবে ভাড়া দিতে হয় এক টাকা করে। তবে একটি মুশকিল আছে। এ বাড়িতে মাছ মাংস আনবার জো নেই। পাঁড়েজি সেকথা আগেই বলে দিয়েছে

অজিত বসলো পেয়ারা তলায় সেই খাটয়ার ওপর। জিজ্ঞাসা করলে—পাঁড়েজিটি কে?

বীরেন বললে—পাঁড়েজি এ বাড়ির মালিক। ট্রেনে আসতে আসতে ভাব হয়ে গেল। এখন বুড়ো হয়ে গেছে, চল্লিশ বছর ধরে কলকাতায় কোন্ এক রাজার বাড়িতে দরোয়ান ছিল। এখন তার ভাইপোকে সেইখানে বহাল করে দিয়ে নিজে কাশীতে থাকে আর ধর্মপুণ্যি করে। থাকবার মধ্যে আছে তার নিজের একটি মেয়ে। বিয়ে দিয়েছে আরা জেলায়। সেইখানেই যে তার ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার পেতেছে। মাঝে মাঝে আসে বুড়ো বাপকে দেখতে।

অজিত জিজ্ঞাসা করলে—পাঁড়েজি থাকে বুঝি ওই ওপরের ঘরে?

বীরেন বললে—হ্যাঁ। পাঁড়েজি থাকে আর তার ভাইপোর স্ত্রী থাকে। বাড়িতে ওরা থাকেই বা কতক্ষণ! পাঁড়েজি ঘুম থেকে ওঠে তো রাত চারটের সময়। 'ব্যোম ব্যোম মহাদেও', 'শিবশম্ভু বিশ্বনাথ' আর 'রাম রাম সীয়ারাম' বলতে বলতে চলে যায় গঙ্গার ঘাটে। সেইখানেই চান-টান করে কোথায় যায় কে জানে। ফিরে তো আসে দেখি বেলা বারোটার সময়। দিব্যি গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান ভাইপোর বউ—ছেলে নেই পুলে নেই, রান্নাবান্না সব ঠিক করে রাখে। রান্না তো ভারী! এমনি ঘুঁটের মত পুরু পুরু রুটি, করলা

ট্যাঁড়স ফ্যাড়স দিয়ে কি যেন একটা ভাজি, আর শিশি থেকে বের করে দেয় একটুখানি আচার। তাই-না খেয়ে দেয়ে পাঁড়েজি একটু ঘুমোয়। বউ তখন খেয়ে নেয়, বর্তন মাজে, তারপর ব্যাস, পাঁড়েজি তার তুলসীদাসী রামায়ণখানি বগলদাবাই করে বেরোয় বাড়ি থেকে, পিছু পিছু বউও বেরোয়। গঙ্গার ঘাটে বসে বসে পাঁড়েজি রামায়ণ পাঠ করে, সামনে একটা পেতলের কানা উঁচু থালা পাতা থাকে, বিস্তর মেয়ে জড়ো হয়, থালার ওপর তারা কিছু কিছু দিয়ে যায়। বউ যে কোথায় যায়, কি করে, জানি না। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে রান্না খাওয়া আর ঘুম! এই তো ওদের কাজ।

পেয়ারা গাছের তলায় খাটিয়ার ওপর বসে বসে দুই শালা-ভগ্নীপতি গল্প করছে, এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে অজিতের মেয়েটা ডাকলে—মামা! মা ডাকছে।

বীরেন উঠে গেল ঘরের ভেতর।—কি বলছিস?

ইন্দুমতী বললে—সেই যে সেই দোকানটা থেকে কিছু গরম ঝুরিভাজা আর আলুভাজা নিয়ে আয় গে চট করে।

বীরেন জিজ্ঞাসা করলে—চা খাওয়াবি বুঝি?

—চা আমার হয়ে গেছে। তুই চট্ করে যাবি আর আসবি! দেরি করিসনি যেন।

—এই তো কাছেই। বলে বীরেন বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঝুনু বললে—আমিও যাই মামার সঙ্গে।

ইন্দুমতী বললে—না। তুমি যাবে না। টুনুকে আগলাবে কে? আমি কাজ করছি।

বাচ্চা ছেলেটার নাম টুনু। সবে তখন সে হাঁটতে শিখেছে। পা পা করে হাঁটে আর ধুপ ধুপ করে পড়ে যায়। কেউ একজন না আগলালে সুমুখে যা পায় হাত দিয়ে টেনে নিয়ে আসে।

ঝুনু গেল না।

বীরেন একটা মস্ত বড় ঠোঙায় করে আলুভাজা ঝুরিভাজা নিয়ে এলো।

এখানে এসেই পোড়া মাটির কিছু বাসন কিনেছে ইন্দুমতী। তাইতে সেই সব সাজিয়ে, মাটির কাপে চা ঢেলে বীরেনকে বললে—যা এইগুলো নিয়ে যা। ছুজনে বসে বসে খেগে যা।

বীরেন সেই সব তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, ইন্দুমতী ডাকলে—দাদা, শোন্।

ফিরে দাঁড়াল বীরেন।

ইন্দুমতী বললে—চা খেয়ে তুই ঝুনুকে, নিয়ে গঙ্গার ঘাটে একটু বেড়িয়ে আয়গে যা।

বীরেনের মাথায় সব কথা সহজে ঢোকে না। বললে—ঝুনুকে নিয়ে আমি একা যাব? তুই যাবি না?

ইন্দুমতী বললে—না।

—আর অজিত কি করবে?

ইন্দুমতী রেগে গেল। বললে—তোর মুণ্ডু করবে। বললে কথা বুঝিস না কেন বলতো! আমি তোর ভগ্নীপতির পিণ্ডি চটকাব বসে বসে। তাই তোদের এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছি।

বীরেন এতক্ষণে বুঝলে কথাটা। হেসে বললে—ও।

চা খেয়ে ঝুনুকে নিয়ে বীরেন চলে গেল। মার কাছে রইলো শুধু টুনু।

অজিত সবই বুঝতে পারলে। পাঁড়েজির উঠানের সেই পেয়ারা গাছটির তলায় খাটিয়ার উপর বসে ভাবতে লাগলো কী সে করবে।

ভেবেছিল ইন্দুমতী আসবে তার কাছে। আসবে, ঝগড়া করবে, গালাগালি দেবে, প্রয়োজন হলে হয়তো বা মেরেই বসবে—এই তার স্বভাব।

কিন্তু ইন্দুমতী এলো না তার কাছে।

সেইখান থেকেই একবার সে দেখবার চেষ্টা করলে ইন্দুমতীকে। কিন্তু ঘরের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না সেখান থেকে।

ওদিকে দুদিন আগে বিয়ে হয়ে গেছে জয়ার। সুহাস তাকে নিশ্চয়ই নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছে। সুষমা একাই আছে। আজ সেখানে তার যাবার কথা। চুপি চুপি গিয়ে একবার তার খোঁজ নিয়ে আসা উচিত।

ইন্দুমতী এলো না যখন, অজিত তখন নিজেই উঠলো।

উঠোন পেরিয়ে ঘরের দোরে জুতোজুটো খুলে ঢুকলো গিয়ে ভেতরে।

ঘরে জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নেই। যাও বা আছে ইতস্ততঃ ছড়ানো। নতুন একটি মাদুর কিনেছে বোধহয়। সেই মাদুরের একপাশে ইন্দুমতী পেছন ফিরে বসে আছে। আর তার পায়ের কাছে কাঠের একটি খেলনা নিয়ে টুনু প্রাণপণে সেটাকে চিবাচ্ছে বসে বসে।

অজিতকে ইন্দুমতী দেখতে পায়নি।

অজিত বসলো মাদুরের ওপর।

ইন্দুমতী এতক্ষণে বোধহয় টের পেলে। তক্ষুনি মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে সুমুখে ফিরে একেবারে লুটিয়ে পড়ল অজিতের পায়ের কাছে। লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

মায়ের কান্না দেখে ছেলেটা হঠাৎ কেঁদে উঠলো।

অজিত খুব বিপদে পড়ে গেল। এখন মাকে থামায় না ছেলেকে থামায়?

হাত বাড়িয়ে টুনুকে নিজের কোলের উপর তুলে নিয়ে ডাকলে—ইন্দু, ওঠো, কেঁদো না।

ইন্দুমতী উঠলো। চোখের জলে সারা মুখ ভেসে যাচ্ছে।

আঁচল দিয়ে চোখ ছুটো মুছলে, মুখটা মুছলে, তারপর আবার কেমন যেন পাগলের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো অজিতের মুখের দিকে।

অজিত বললে—তোমার এত কথা, অথচ একটা কথাও বলছ না তুমি ?

ইন্দুমতী ধরা-ধরা গলায় বললে—তুমি যে এমন করবে তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি বোবা হয়ে গেছি।

বলতে বলতে আবার তার চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে এলো। ঠোঁট ছুটো থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

অজিতও ঘন ঘন তাকাচ্ছিল ইন্দুমতীর মুখের দিকে। কেমন যেন নতুন নতুন মনে হচ্ছে মেয়েটাকে। যাকে কুৎসিত মনে হতো তাকে যেন আর কুৎসিত মনে হচ্ছে না।

ছেলেটা থেমেছে কিন্তু ভারী বিরক্ত করছে অজিতকে। ছোট ছোট হাত ছুটি দিয়ে অজিতের চুল ধরে টানছে আর হাঁ হাঁ করে তার নাক কামড়ে ধরতে যাচ্ছে।

অজিত তাকে তার মার কোলে বসিয়ে দিলে। বললে—এটা ভারী তুষ্টু হয়েছে।

ইন্দুমতী বললে—এ ছুটোকে তো তুমিই দিয়েছ, এদের নাও, নিয়ে আমাকে ছুটি দাও।

—ছুটি দেবো ?

—হ্যাঁ। বলে লালরঙের কাঠের সেই খেলনাটা হাতে দিয়ে টুনুকে একটু দূরে বসিয়ে দিলে ইন্দুমতী। তারপর বললে—আমাকে তোমার ভাল লাগে না। আমাকে যখন চাও না, তখন আর আমি তোমার পথের কাঁটা হয়ে থাকতে চাই না।

—কি করবে তুমি ?

—আমি মরব। মরা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই।

বলতে বলতে আবার তার ছু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামলো।

আবার সে তেমনি করে অজিতের কোলের উপর মুখ গুঁজে দিয়ে বললে—মনের মত স্ত্রী তুমি পাওনি, কিন্তু আমি? আমি যা চেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছিলাম। সেই তুমি যদি আমার কাছ থেকে চলে যাও—

কথাটা সে শেষ করতে পারলে না। আবার ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

এ রকম করে ইন্দুমতী লুটিয়ে পড়েনি কখনও। এ রকম কথাও সে কখনও বলেনি। অজিত ছু'হাত দিয়ে তাকে তুলে দিলে। বললে—কেঁদো না। চুপ কর।

এবার সে সত্যিই চুপ করলে। খেলনা ছেড়ে ছেলেটা আবার তার মাকে এসে ধরেছিল। তাকে সামলাতে গিয়েই ইন্দুমতীকে চুপ করতে হলো।

অজিত বললে—এদের ছেড়ে তুমি মরতে পারবে?

—কেন পারবো না? ওরা ওদের বাপের কাছে থাকবে। আমি কার কাছে থাকবো?

এই বলে ছেলেকে কোলে নিয়েই ইন্দুমতী অজিতের কাছে এসে বসলো। মনে হলো এতক্ষণ পরে সে যেন খানিকটা সহজ হয়ে এসেছে। আবার সে তার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁগা, তুমি এই কাজ করতে পারলে? আমি খুব দুষ্টু, খুব-মুখরা, আমি জানি। কিন্তু তুমি যে খুব ভাল মানুষ গো! তুমি যে—

আবার তার গলাটা কে যেন চেপে ধরলে। আবার তার চোখে জল এসে গেল।

—আঃ আবার কাঁদছে ছ্যাখো!

অজিত চেঁচিয়ে উঠলো।

ইন্দুমতী বললে—আর কাঁদবো না, সত্যি বলছি আর কাঁদবো না। আর আমি তোমাকে জ্বালাব না। তুমি তোমার ছেলে মেয়ে নিয়ে

নাও আমার কাছ থেকে। আমি মরি। সত্যি বলছি—তোমাকে কষ্ট দিতে আমি আর বাঁচতে চাই না।

এই বলে নিজে খানিকটা শান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আর একবার চা খাবে তো ?

অজিত বললে—আবার কেন ?

—বিকেলে তো তুমি দু'বার চা খেতে। সে অভ্যেস কি তোমার বদলে গেছে নাকি ?

অজিত বললে—তা বেশ। করবে তো কর।

—একে ধরো একটু।

ছেলেকে অজিতের কোলে বসিয়ে দিয়ে ইন্দুমতী গেল চা করতে।

বাইরে উনোন। সেখান থেকে ছুড়ে ছুড়ে কথা বললে শোনো যায়।

কাঠের আগুনের ছাইগুলো উড়িয়ে দিয়ে উনোনের ওপর ইন্দুমতী চায়ের জল বসাতে বসাতে বললে—দেখা কি আর হতো তোমার সঙ্গে ! কত করে বলেছিলাম মা অন্নোপূন্নোকে, কেঁদে কেঁদে মানত করেছিলাম—তবে না দেখা হলো ! এইখানে গঙ্গায় ডুবে যদি আমাকে মরতে হয়, অন্নপূন্নোর মানত শোধ করে তবে আমাকে মরতে হবে।

এই বলে সে আবার ঘরের ভেতর এলো। অজিতের কাছে গিয়ে বললে—একটা কথা জিগ্যেস করবো, রাগ করবে না ?

—না, রাগ করব না। বল।

ইন্দুমতী তখন চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাগা, সুষমা তোমাকে ভালবাসে ?

সুষমার নাম সে এই প্রথম উচ্চারণ করলে।

কথাটা অজিত শুনেছিল, কিন্তু না শোনবার ভান করে ছেলেটাকে নিয়ে খেলা করতে লাগলো।

—চুপ করে রইলে যে? কি বলবে? বলবে সুষমা কোথায় তুমি জানো না। না সেকথা তুমি বলতে পারবে না আমি জানি।

—জানো?

—জানি। তুমি মিছে কথা সহজে বল না।

অজিত বললে—যদি বলি, বাসে?

—আমার চেয়েও?

অজিত মুখ তুলে তাকালে ইন্দুমতীর দিকে। বললে—তুমি আমাকে ভালবাসো নাকি?

কথাটার জবাব দিতে গিয়েও দিতে পারলে না ইন্দুমতী। ফ্যালফ্যাল করে বোকার মত তাকিয়ে রইলো অজিতের মুখের দিকে।

—কি দেখছো?

—কিছু না।

খোকা তার বুকের একটা বোতাম দাঁত দিয়ে চেপে ধরে চিবোবার চেষ্টা করছিল। মুখের লালায় তার জামাটা ভিজিয়ে দিচ্ছে দেখে ইন্দুমতী হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিতে গিয়ে অজিতের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো—আচ্ছা, সুষমা তার অতবড় মেয়েটার সামনে—

বলেই সে অজিতের কানে কানে চুপি চুপি কি যে বললে কিছুই শোনা গেল না। অজিত একটু হেসে ইন্দুমতীর গালে আস্তে আস্তে একটা চড় মেরে দিয়ে বললে, যাঃ ও!

—যাই বাবা, ওদিকে আবার চায়ের জল গরম হয়ে গেছে।

ইন্দুমতী একেবারে চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

পোড়া মাটির চায়ের কাপটি নামিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে তার কোল থেকে তুলে নিয়ে বললে—খাও। আমি ততক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলি।

চা খেতে খেতে অজিত বললে—আমি অবাক হয়ে গেছি ইন্দু তোমার ব্যাপার দেখে।

—আমার আবার কি ব্যাপার দেখলে তুমি?

অজিত বললে—কোথায় গেল তোমার সেই তিরিক্ষে মেজাজ, সেই গালাগালি—

ইন্দুমতীর বোধহয় লজ্জা হলো। সলজ্জ একটু হেসে বললে—জানি না —যাও!

অজিত নীরবে চা খাচ্ছিল, ইন্দুমতী বললে—তুমি আমাকে কি বলতে? আমার গায়ের রং কালো বলে বলতে—মা কালী। হ্যাঁ, মা কালীই ছিলাম আমি। তোমার মত স্বামী পেয়েছিলাম, ছেলে পেয়েছিলাম, মেয়ে পেয়েছিলাম, মনের আনন্দে মা কালীর মত দুষ্টু লোকের মুণ্ডু কেটে কেটে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াতাম। তারপর যে-মার তুমি আমাকে মারলে, সব একেবারে ঠাণ্ডা করে দিলে।

আবার গলাটা তার ধরে এলো, আবার দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়ালো। ঠোঁটদুটো কাঁপিয়ে ধরা-ধরা গলায় বললে—আমি একেবারে বোকা হয়ে গেলাম।

অজিত বললে—ওই রকম করে কাঁদো যদি, তাহলে আর কিছু বলবো না।

ইন্দুমতী আঁচল দিয়ে তার চোখ দুটো মুছলে ভাল করে।

একটু পরে সামলে নিয়ে বললে—আমি মরে গেলে সুষমাকে তুমি বিয়ে কোরো। আজকাল বিধবারা তো বিয়ে করে শুনছি।

অজিত বললে—আবার সেই কথা?

—আর কী কথা আমি বলব গো? সুষমাকে তোমার ভাল লাগে আমি জানি। কিন্তু এমনি করে লুকিয়ে লুকিয়ে গাঁ ছেড়ে বাইরে বাইরে কাটাবে তুমি—তোমার নিন্দেয় চারদিকে টি-টি পড়ে যাবে, না-না ছি-ছি, আমি মরেও যে সুখ পাব না।

অজিত বললে—মরে গেলে তো দেখতে আসছো না!

ইন্দুমতী বললে—বা-রে! মরবার পর আমি ভূত হব না? আমাকে কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু আমি সব দেখতে পাব। কোথায় থাকবো জানো? শাঁকচুন্নী হব তো—

—কেন, শাঁকচুন্নী হতে যাবে কেন?

—তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি। পাপ হয়েছে যে!

অজিত হেসে উঠলো।

—হেসো না। আমি সত্যি বলছি।

সত্যি যে ইন্দুমতী বলছে—তা সে জানে। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা নারী। এমনি তার সংস্কারাচ্ছন্ন সহজ সরল বিশ্বাস।

ইন্দুমতী বললে—কোথায় থাকবো তাও আমি ভেবে ভেবে ঠিক করে রেখেছি। দিনের বেলা থাকবো আমাদের উঠোনের সেই জাম গাছে। আর রাত্তির বেলা—তুমি আর সুষমা যেখানে থাকবে, তারই কাছাকাছি কোথাও আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকবো।

কথাগুলো অজিত শুনছিল আর হাসছিল। ইন্দুমতী কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। আপন মনেই সে বলে যেতে লাগলো, কিন্তু আমার ছেলে-মেয়ের গায়ে হাত যদি তোলে সুষমা, আর তুমি যদি তাদের অগ্রাহ্য কর তাহলে কিন্তু আমি দুজনেরই ঘাড় মটকাবো।

হো-হো করে হেসে উঠলো অজিত।

ইন্দুমতী বললে—এখনও তুমি আমার কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দিতে চাও?

অজিতের হাসি থামলো।

ইন্দুমতী বললে—না না, তুমি কী করবে একটা ঠিক কর। মরবার আগে আমি জেনে যাই।

—তুমি মরবে, এইটাই ঠিক করে রেখেছ ?

—হ্যাঁ, মরবো।

—কেমন করে মরবে ?

—ঝুনু টুনুকে তুমি নিয়ে যাবে, আমি গঙ্গায় ডুবে মরবো।

—পারবে মরতে ?

—একথা দশবার বলতে পারব না যাও।

কাপটা তুলে নিয়ে ইন্দুমতী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আবার সে ফিরে আসতেই অজিত বললে—আজকের রাতটি আমাকে ভাববার সময় দাও।

ইন্দুমতী বললে—আজ রাত্তিরে তুমি এইখানে থাকবে, এইখানে খাবে।

অজিত বললে—এখানে তো এই একখানি ঘর। বীরেন কোথায় শোবে ?

ইন্দুমতী বললে—দাদা কি এই ঘরে থাকে নাকি ? দাদা তো দিনরাত ওই গাছতলায় খাটে শুয়ে থাকে।

—বেশ তাহলে সেই ফটোর দোকানে আমার জামা-কাপড় আছে আমি নিয়ে আসি !

জামা-কাপড় সুষমার কাছে না থেকে ফটোর দোকানে কেন—ইন্দুমতী ভাবলে একবার তাকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু অজিত আজ রাত্রে এইখানে খাবে এইখানে থাকবে এই আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে যেন সব-কিছু ভুলে গেল।

অজিত ঘরের বাইরে এসে জুতো পায়ে দিচ্ছিল, ইন্দুমতী ছেলে কোলে নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে—বলে তো দিলাম যাবে! কিন্তু মাছ ছাড়া তুমি খেতে পারো না, এখানে যে মাছ খাবার জো নেই !

অজিত বললে—মাছ খাব না।

—ওখানে কি মাছ খেতে পাও না? সুষমা মাছ রান্না করে দেয় না তোমাকে?

জবাব দেবার ইচ্ছে ছিল না অজিতের, তবু বললে—হ্যাঁ দেয়।

দেয় না—শুনলেই যেন খুশী হতো ইন্দুমতী। বললে—খুব ভালো আটা আছে, আর পাঁড়েজি খুব ভালো ঘি এনে দিয়েছে। পরোটা করি? পরোটা খেতে তো তুমি ভালবাসো!

—হ্যাঁ, তাই কর।

বলেই অজিত চলে গেল।

ইন্দুমতী একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর টুনুর দিকে নজর পড়তেই বললে—ওই ছাখ, বাবা চলে গেল।

টুনু একগাল হেসে বলে উঠলো—বা—বা—

—ওগো শুনছো?

না, পিছু ডাকবো না।

উঠোনে চায়ের কাপ ডিস পড়ে আছে। ইন্দুমতী সেইগুলো আনতে গিয়ে ভাবলে, চলে তো গেল, ঠিকানাও তো জানে না, আর যদি ফিরে না আসে? সুষমা যদি তাকে আসতে না দেয়? ছেড়ে না দিলেই বোধকরি ভালো করতো।

নির্বোধ নারী। কিসে ভালো হয়, কিসে মন্দ হয়, কিছুই সে জানে না। নিজেকে কোনোদিন সে ছোট বলে ভাবেনি। কিন্তু আজ তার মনে হলো—সুষমা তার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমতী, অনেক বেশী সুন্দরী। নিজেকে নিতান্ত অসহায় বলে মনে হতে লাগলো ইন্দুমতীর।

অন্নপূর্ণার মন্দির কোন্‌দিকে সে জানে না। সেদিনের সেই আসন্ন সন্ধ্যায় পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বঞ্চিত জীবনে

বীতশ্রদ্ধ পুত্রের জননী ইন্দুমতী শূন্য আকাশের দিকে তাকালে। মন্দির যেদিকেই হোক, তুমি তো সবই জানো মা অন্নপূর্ণা, তোমারই দয়ায় একবার তাকে ফিরে পেয়েছি, তুমিই আবার তাকে ফিরিয়ে এনে দাও!

এই বলে তার প্রার্থনা জানাতে গিয়ে আবার ইন্দুমতী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

তেরো

অজিত সোজা গিয়েছিল অনিলবাবুর ফটো-স্টুডিওতে নিজের জামা-কাপড় আনবার জন্যে। ভেবেছিল কাপড় জামার "ব্যাগটি" নিয়ে সে যাবে একবার সুষমার কাছে। তিন দিন আগে জয়ার বিয়ে হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। সুষমা ওই অত বড় বাড়িতে একা কি করছে কে জানে। হয়ত বা সে তারই পথ চেয়ে বসে আছে।

এদিকে এই বিভ্রাট।

ইন্দুমতীর কথাটা সুষমাকে বলবে কিনা ভাবতে ভাবতে অজিত ঢুকলো গিয়ে অনিলবাবুর স্টুডিওর ভেতর।

অনিলবাবু সামনে বসে খাতায় কি যেন লিখছিলেন। মুখ তুলে অজিতকে দেখেই বললেন—আমি তো ভাবলাম বুঝি আর আসবেন না। বসুন। তামাক খাবেন তো?

গড়গড়ায় টান দিয়ে দেখলেন, কলকের আগুনটা নিবে গেছে। ডাকলেন, পাঁচু, দে বাবা একবার কলকেটা পালটে।

কাঠের একটা ফুটো করা জায়গায় সারি সারি কয়েকটা কলকে সাজানোই থাকে। টিকেতে আগুন ধরিয়ে পাঁচু এসে পুরনো কলকেটা শুধু পালটে দেয়।

অনিলবাবু কথাও একটু বেশী বলেন, তামাকও একটু বেশী খান।

কলকেটা দিয়ে পাঁচু দাঁড়িয়ে রইলো।

—দাঁড়িয়ে কেন? কিছু বলবি?

পাঁচু বললে—বাড়ি যাব তো!

—ও হ্যাঁ। অনিলবাবু ভুলে গিয়েছিলেন। পকেট থেকে দুটি টাকা বের করে পাঁচুকে দিয়ে বললেন—কিছু গুড় কিনে নিয়ে যাবি

বাবা !···বুঝলেন অজিতবাবু, বাজারে আখের গুড় উঠেছে খুব সুন্দর। একেবারে সোনার মত রং। রাত্রে আজ আপনাকেও পাঠিয়ে দেবো একটুখানি। দেখবেন খেয়ে।

অজিত কি যেন ভাবছিল। খাবার কথায় তারও হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ থেকে এখানে আর সে খাবে না। তার অজ্ঞাত-বাসের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।

অজিত বললে—আমার খাবার পাঠাতে বারণ করুন, আজ থেকে আমি আর এখানে খাবও না, থাকবোও না।

অনিলবাবু বললেন—সেই কথাই বলতে এসেছেন বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই কথা বলতে এসেছি আর আমার ব্যাগটা নিতে এসেছি।

গড়গড়ার নলটা অজিতবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে অনিলবাবু তাকালেন পাঁচুর দিকে। বললেন—নিজের কানেই তো শুনলি বাবা। মাকে গিয়ে বলবি আজ থেকে অজিতবাবু খাবেন না।

পাঁচু চলে যেতেই একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালো।

—একটা ফটো তুলতে হবে স্যার।

অনিলবাবু তার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি কি চান। ভদ্রলোকের খালি পা, গায়ে একটা শার্ট, শার্টের ওপর কোমরে একটা গামছা বাঁধা।

অনিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় ? কেদার-ঘাট না মণি-কর্ণিকা ?

লোকটি বললে—মণিকর্ণিকা।

অনিলবাবু হাঁকলেন, শম্ভু !

ভেতর থেকে সাড়া এলো,—কি বলছেন ?

—ফ্ল্যাশ ক্যামেরা রেডি ?

—হ্যাঁ স্যার, রেডি।

—শ্মশানে যেতে হবে। চটপট হাত চালান।

—চালাচ্ছি।—বলে শম্ভু চুপ করে রইলো।

অনিলবাবু আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে হাত পাতলেন।—'দিন, টাকা দিন দশটা।'

—দশ টাকা কেন স্যার, এমনি ছবির জন্যে তো আপনি পাঁচ টাকা নেন।

—হ্যাঁ, জ্যান্ত মানুষের ছবি পাঁচ টাকা, আর মড়ার ছবি দশ টাকা।

—একেবারে ডবল কেন স্যার? মড়া তো চুপ করে থাকবে।

—মড়ার আশেপাশে যারা থাকবে তারা চুপ করে থাকবে না, ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদবে, গোমরা মুখ করে বসে থাকবে। প্লেট নষ্ট করবে, বাল্ব্ নষ্ট করবে। যাকগে, বুড়ো বুড়ী না ছেলেছোকরা?

—আজ্ঞে না, ছেলেছোকরা নয়, বুড়ো বুড়ীও নয়—

কথাটা তাকে শেষ করতে দিলে না অনিলবাবু। বললে—তবেই দেখুন, কাঁদবার লোক আছে। মড়া হচ্ছে গিয়ে প্রথম পক্ষের স্ত্রী। ফার্স্ট ক্লাস মড়া, কেউ কাঁদবে না, কিছুটি বলবে না, গেলেই বাঁচি-গোছের অবস্থা, আমাদেরও ছবি তুলে সুখ। না কি বলেন অজিতবাবু?

এ যেন অজিতকেই উদ্দেশ করে বলা। তবে কি অনিলবাবু সব জেনে ফেলেছেন নাকি? কিন্তু তাই-বা কেমন করে সম্ভব?

অনিলবাবু আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, শ্মশানের ভদ্রলোক দশ টাকার একটি নোট অনিলবাবুর হাতে দিয়ে বললে—একটু চটপট করুন স্যার, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

এই যে, হয়ে গেছে। বলে খাতা খুলে অনিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নাম বলুন!

লোকটি বললে—শ্রীপরিমল ব্যানার্জী।

—ঠিকানা?

—সাত নম্বর হারার বাগ।

রসিদ একটি লিখে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে অনিলবাবু বললেন—যিনি ডেলিভারি নিতে আসবেন তিনি যেন এই রসিদটা নিয়ে আসেন।

বলেই তিনি আবার শম্ভুকে ডাকলেন—শম্ভু, হলো?

শম্ভু বললে—আজ্ঞে না স্যার। একটু বিপদে পড়ে গেছি। একটা নষ্ট করেছেন, আর একটা হবে। চুল ঠিক হচ্ছে না।

—চুল ঠিক হচ্ছে না কি রকম?

—টেরিটা ভালো করে না বাগিয়ে ইনি ফটো তুলবেন না।

অনিলবাবু হাসলেন একটুখানি। অজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখুন তো কোন্ লাট সাহেব এলেন ফটো তোলাতে।

অজিত উঠে ভেতরে গেল।

ভেতরে গিয়ে তার চক্ষুস্থির! দেখলে তারই কন্যা ঝুমু হাত-আরশিটা দু'হাত দিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আর চেয়ারে বসে বীরেন প্রাণপণে চুল আঁচড়াচ্ছে।

অজিত তাদের দেখেই দু'পা পিছিয়ে এলো। কাছে যেতে সাহস হলো না। মেয়েটা যদি 'বাবা' বলে চেঁচিয়ে ওঠে! সব জানাজানি হয়ে যাবে।

কাঠের পার্টিশনের আড়াল থেকে হাতের ইশারায় অজিত শম্ভুকে কাছে ডাকলে। বললে—ফ্ল্যাশ-ক্যামেরা নিয়ে তুমি চলে যাও। এদিকটা আমি সামলাচ্ছি।

এই বলে তাকে চটপট বিদেয় করে দিয়ে নিজের ব্যাগটি হাতে নিয়ে বীরেনের কাছে এসে দাঁড়ালো।

পা টিপে টিপে অজিত এসে দাঁড়ালো চুপিচুপি। ভেবেছিল সাবধান করে দেবে, তাকে দেখে যেন আঁতকে না ওঠে হতভাগা! কিন্তু বীরেন তার চুল নিয়ে তখন এতই তন্ময় যে, সে একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখলে না।

কিন্তু বোকা মেয়ে ঝুনু—নির্বোধ শিশু, আর-একটু হলেই দিয়েছিল সব গোলমাল করে। কেমন করে সে টের পেলে কে জানে। পেছন ফিরে তাকিয়েই সে বলে উঠলো—বাবা!

খুব জোরে বলেনি তাই রক্ষা! অনিলবাবু শুনতে পাননি।

অজিত বললে—চুপ কর। আমাকে এখন বাবা বলে ডেকো না।

বীরেনের মুখের সুমুখ থেকে আরশিটা তখন সরে গেছে।

বীরেন বোধকরি ঝুনুকে ধমক দিতে গিয়েই দেখতে পেলে অজিতকে। তার একটুখানি লজ্জা হলো। গঙ্গার ঘাটে ঝুনুকে নিয়ে বেড়াতে যাবার নাম করে সে বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। গঙ্গার ঘাটে না গিয়ে সটান এসে ঢুকেছে এইখানে। ফটো না তুলিয়ে সে কাশী থেকে যাবে না।

বীরেন বললে—ও-বেলায় তুমিই ফটো তুলতে দাও নি।

অজিত বললে—সেই জন্যেই তো এলাম—বীরেনবাবুর খুব ভাল একখানা ছবি তুলে দেবো বলে। নাও, ঠিক হয়ে বোসো।

এই বলে সে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, বীরেন বললে—সেই তিনি গেলেন কোথায়?

—তিনির দরকার নেই। আমিই তুলে দিচ্ছি।

অজিত যে ফটো তুলতে জানে—বীরেনের তা জানা ছিল না। ভাবলে বুঝি সে রসিকতা করবে তার সঙ্গে। শালা-ভগিনীপতি সম্বন্ধ, রসিকতা করা বিচিত্র নয় কিছু। বীরেন দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে—না, মাইরি না, ফটো একটা তুলতে দাও। অনেক কষ্ট করে অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছি।

—দ্যাখো না, কি রকম তুলে দিচ্ছি।

—তুমি তুলবে? ধেৎ, ভাল হবে না।

—ভাল না হয়, আবার তুলে দেবো।

বীরেন বললে—দেবে কখন? আমরা এখান থেকে চলে যাব না?

সর্বনাশ! একে বেশী কথা বলতে দেওয়াও অন্যায়। অজিত তাকে এক ধমক দিয়ে বললে—যা বলছি শোনো, কাল বেলা দশটার সময় এসে ছবি নিয়ে যেয়ো। টাকা দিয়েছ নাকি?

বীরেন বলে উঠলো—নিশ্চয়। দু'খানা ছবির টাকা দিয়েছি।

বলেই সে তার পকেট থেকে একখানা রসিদ বের করে দেখালে। —এই ভ্যাখো। একখানা তোলা হয়ে গেছে ঝুনুকে নিয়ে। তবে তাতে আমার চুলটা ঠিক—

অজিত তাকে আর বেশী কথা বলতে না দিয়ে তার একখানা ছবি তুলে দিলে। দিয়েই বললে—আমার এই ব্যাগ নিয়ে তোমরা চলে যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

যাবার ইচ্ছা বীরেনের ছিল না। অজিত ছবি তুলতে জানে সে-বিশ্বাস তখন তার হয়েছে। চট্ করে তার কাছে গিয়ে চুপি-চুপি বললে —ছুটে ইন্দুকে গিয়ে ডেকে আনব? সে বলছিল তার ফটো নেই।

ঘাড় নেড়ে অজিত বললে—না। ঝুনুকে নিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও এখান থেকে।

বীরেন বললে—যাই।

যাই বলে অজিতের ব্যাগটা তুলে নিয়ে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালো। বললে—ঝুনুর ছবি ভাল হয়নি নড়েছিল খুব।

—কে বললে?

—যিনি ছবি তুলেছিলেন সেই ভদ্রলোক। বললেন, তোমার ছবি কিন্তু ভাল হবে না খুকু। তুমি তোমার মামার সঙ্গে আর-একবার বসবে।

অজিত কি যেন ভাবলে। ঝুনুর ছবি ভাল হবে না—কথাটা শুনতে কেমন যেন তার ভাল লাগলো না। বললে—আচ্ছা, নাও তবে চট্ করে এইখানে বসে পড়ো ঝুনু। তোমার একখানা ভাল ছবি তুলে দিই।

বীরেন হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এলো। বললে—আমি ওকে কোলে নিয়ে বসি।

না। বলে বীরেনকে সরিয়ে দিয়ে অজিত বললে—ঝুনু একা বসবে।

নিতান্ত ছোট বাচ্চা। কেমন করে বসবে, কেমন করে কোন্‌দিকে তাকাবে কিছুই জানে না। অজিত তাকে বসিয়ে দিতে গিয়ে দেখলে, তার মুখখানা একটু পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। চুলগুলো আঁচড়ে না দিলে বব্‌ চুল তার মুখের ওপর এসে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি তোয়ালেটা এনে নিজেই তার সুন্দর মুখখানি মুছে দিয়ে, চিরুনি নিয়ে চুল আঁচড়ে, অজিত তাকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললে—এই দিকে এমনি করে তাকিয়ে থাকবে। নড়ো না।

ঝুনু বললে—না নড়বো না।

অজিত ঢুকলো গিয়ে কাঠের পার্টিসন দেওয়া ক্যামেরার ঘরে। কালো কাপড়টা মাথায় ঢাকা দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখে, মেয়েটা এরই মধ্যে অনেকখানি সরে গেছে।

অজিত সেইখান থেকেই বললে—বীরেন, দাও তো ওকে একটু বাঁ-দিকে সরিয়ে।

আর একবার ফটো তোলাতে না পেয়ে বীরেন এতক্ষণ মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার একটু খুশী হয়ে ব্যাগটা হাতে নিয়েই এগিয়ে এলো। ঝুনুকে বললে—বাঁদিকে সরে বোস্‌।

অজিত বললে—তোমার বাঁদিকে নয় ঝুনুর বাঁদিকে।

মেয়েটার হাতে ধরে টেনে বীরেন তাকে বাঁ দিকে সরিয়ে দিলে।

এমন সরালে যে ঝুনু ফ্রেমের বাইরে চলে গেল।

—আ হা হা, ওকি করলে? অতটা নয় একটুখানি সরিয়ে দাও।

বীরেন বললে—আমি ওর পাশে এইখানে দাঁড়াই তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।

কাঠের ঘরের ভেতর থেকে অজিত চিৎকার করে উঠলো—আঃ, যত তাড়াতাড়ি করতে চাচ্ছি, তুমি ততই বাগড়া দিচ্ছ।

এই বলে নিজেই বেরিয়ে এসে ঝুনুকে ঠিক করে বসিয়ে দিয়ে গেল অজিত।

বীরেন সেখান থেকে সরে যেতে যেতেও আর একবার শেষ চেষ্টা করতে ছাড়লে না।—আচ্ছা মানুষ যা-হোক, আমি বসলে কী আর এমন ক্ষতি হতো! দাও না বসিয়ে!

অজিত—বললে—না।

বলেই আলো জেলে দিয়ে অজিত ভেতর থেকে ঝুনুকে আর একবার সাবধান করে দিলে, এবার আর নড়বে না ঝুনু। হাসি হাসি মুখ—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। বাস! হয়ে গেছে।

ছবি তুলে, আলো নিবিয়ে দিয়ে, অজিত বেরিয়ে এলো।

—যাও এবার। ঝুনুকে নিয়ে তুমি চলে যাও বীরেন।

চলে তারা সত্যিই যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা পড়ল দোরের কাছে। অনিলবাবু ঢুকলেন দুজন ফটো তোলাবার নতুন খদ্দের সঙ্গে নিয়ে।

একজন সুহাস, একজন জয়া। নব-বিবাহিত দম্পতি।

অজিত যে এমন বিপদে পড়বে তা সে কল্পনাও করেনি।

সুহাস বলে উঠলো—একি? আপনি না দেশে চলে গেছেন? বিয়ের দিন আপনার খোঁজ করতে গিয়ে দেখি আপনি নেই। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম। মা বললেন—আপনি দেশে চলে গেছেন।

জবাব দিতে গিয়ে অজিত থতমত খেয়ে গেল। বললে—গিয়েছিলাম, কিন্তু স্টেশন থেকে ফিরে আসতে হলো।

বলেই সে বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, তোমরা যাও। আমি যাচ্ছি।

ঝুনুকে নিয়ে বীরেন বেরিয়ে গেল।

নব-বিবাহিতা জয়া এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এইবার হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে অজিতের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। তার দেখাদেখি সুহাসও করলে।

ওদের আশীর্বাদ করতে গিয়ে অজিতও তাকালে জয়ার দিকে। এই তো সবে বিয়ে হয়েছে তার কিন্তু এরই মধ্যে একটি প্রসন্ন লাবণ্যে মুখখানি যেন তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সে যে সুখী, সে যে আনন্দিত, সে কথা আর কাউকে বলে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। সারা অঙ্গে তার খুশির হিল্লোল।

অনিলবাবু ক্যামেরা ঠিক করছিলেন। বললেন—আপনি ওদের ঠিক করে বসিয়ে দিন অজিতবাবু।

অজিত একটু মুশকিলে পড়ে গেল। বললে—আপনি আসুন!

—আরে এ হচ্ছে গিয়ে 'নিউলি ম্যারেড কাপল', এ তো আমাদের একেবারে পেটেন্ট।

বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন অনিলবাবু।

—দুটো ছবি হবে তো? একটা কনে বসে, বর দাঁড়িয়ে; আর একটা বর বসে কনে দাঁড়িয়ে। নিন কে আগে বসবেন বসুন।

এইবার মুশকিল হলো বর কনেকে নিয়ে।

সুহাস বললে—তুমি বোসো, আমি দাঁড়াই।

জয়া বলে—না, তুমি বোসো, আমি দাঁড়াই।

যাই হোক দুটো ছবিই তাদের তোলা হলো।

অজিত চুপ করে দূরে দাঁড়িয়ে দেখলে শুধু।

পালিয়ে যাবার উপায় নেই। অথচ দাঁড়িয়ে থাকাও বিড়ম্বনা।

ভাবলে, আজ আর বোধহয় সুষমার কাছে যাওয়া তার সম্ভব হবে না।

ফটো তুলতে সময় কম লাগলো না। অনিলবাবু কি জানি কেন খুব মন দিয়ে ছবি দুটো তুললেন।

ছবি তোলা শেষ হলে অজিত বললে—তোমরা যাও। আমার একটু কাজ আছে।

এই বলে সরে পড়বার মতলবে যেই সে পেছন ফিরেছে, সুহাস এগিয়ে এসে তার পথ আগলে দাঁড়ালো। বললে—আপনি কি আজই দেশে চলে যাচ্ছেন?

সর্বনাশ! এ কী প্রশ্ন? জবাব দিতে গিয়ে অজিত আবার বিপদে পড়লো। বললে—আজ রাত্রে হয়তো যাব না। কেন বল তো?

সুহাসবললে—মাকে নিয়ে আমরা একটু বিপদে পড়েছি। আপনি গিয়ে যদি মাকে একটু বুঝিয়ে বলতেন—

—কি বলবো?

সুহাস বললে—আচ্ছা, এ কী রকম নিয়ম বলুন তো হিন্দুদের, মেয়ের যতদিন না ছেলেপুলে হচ্ছে ততদিন নাকি আমার বাড়িতে মাকে যেতে নেই! আপনি এইসব কুসংস্কার মানেন?

অজিত একটু কাষ্ঠহাসি হাসবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারলে না! জয়ার দিকে তাকিয়েই মুখের চেহারা তার অন্যরকম হয়ে গেল। না পারলে হাসতে, না পারলে কোনও কথা বলতে।

জয়া তখন মুখ ফিরিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে।

নিজের ছেলেপুলে হবার কথা শুনে, না তার মায়ের কথা শুনে, তাই বা কে জানে!

সুহাস বললে—মাকে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারলাম না আমার বাড়িতে। আমার বাড়িতে তাঁর নাকি এখন জল পর্যন্ত খাবার

উপায় নেই। বললাম—আমার বাড়িতে না যাবেন, দিদির বাড়িতে চলুন। মা বললেন—ও একই কথা হলো।

অজিত চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনে যাচ্ছিল তার কথাগুলো।

সুহাস জয়ার দিকে একবার তাকালে। বললে—মেয়েটি মায়ের দিকে। বলে কি না—মা কাছে থাকলে আমার কোনো স্বাধীনতা থাকবে না। এ বরং বেশ হয়েছে। আমার একা ঘর। আমি যা-খুশী তাই করবো।

জয়া তাদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হেসেই মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সুহাস বললে—ওই দেখুন, হাসি দেখুন! শেষ পর্যন্ত আমাকে কি ব্যবস্থা করতে হলো জানেন? মাকে বললাম—বেশ তাহলে আপনি এই বাড়িতেই থাকুন। বাড়িটা ভাল, ভাড়া বেশী নয়, নীচের ঘরগুলো ভাড়া দিয়ে দেবো, উনি থাকবেন দোতলায়। একা-একা থাকা তো মুশকিল। আমার বাড়ির একজন ঝিকে রেখে দিয়েছি ওঁর কাছে।

অজিত এতক্ষণে কথা বললে। বললে—ভালো করেছ।

বলেই পালাতে চাচ্ছিল অজিত। কিন্তু সুহাসের কথা যে আর ফুরাতেই চায় না।

বললে—আসল কথাই কিন্তু এখনও আমার বলা হয়নি। জয়াকে নিয়ে আমি বেরিয়েছি—আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যাব। রাত্রে সেখানে খাবার নেমন্তন্ন। ভাবলাম দুজনের একটা ফটো তুলিয়ে নিই! এখন এই পথেই চলে যাব আমার সেই বন্ধুর বাড়ি। ফিরতে রাত হবে। নইলে আপনাকে আমি আজই আমার বাড়িতে একবার নিয়ে যেতাম। কাল কিন্তু আপনার দেশে যাওয়া হবে না কিছুতেই। এই আপনার হাতে ধরে বলছি—কাল বেলা দশটা-এগারোটা নাগাদ আপনি যাবেন আমার বাড়িতে।

সেইখানে খেতে হবে আপনাকে। বলুন—আপনার ঠিকানা বলুন, আমি নিজে এসে নিয়ে যাব আপনাকে।

কথা বলার মাঝখানে সুহাস একটু ফাঁক পর্যন্ত দিলে না যে, অজিত প্রতিবাদ করে।

অজিত তবু কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুহাস নাছোড়বান্দা। কোনও কথাই সে শুনতে চায় না।

—আপনি না থাকলে বিয়ে আমার হতো না। জয়াকে আমি পেতাম না অজিতবাবু। আর সেই আপনি কি না আমার বাড়িতে না খেয়ে, দেশে চলে যাবেন? তা হতেই পারে না। কোথায় আছেন বলুন। আর নয় তো চলুন। এই পথে আপনার আস্তানাটা দেখেই যাই।

জয়া এতটা বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল অজিত ঠিক ফাঁক কেটে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু পারলে না বেরোতে। অজিতের শালা বীরেনকে সে চেনে না, কিন্তু ঝুনুকে চেনে। বউ সেজে রয়েছে বলে ঝুনু বোধ হয় তাকে চিনতে পারেনি। তবে ঝুনুকে দেখেই এটুকু সে বুঝতে পেরেছে যে অজিতের স্ত্রী ইন্দুমতী নিশ্চয়ই কাশী পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। যাই হোক, অজিতকে বাঁচাতে হলে তারই একটুখানি এগিয়ে যাওয়া উচিত।

জয়া সত্যিই এগিয়ে এলো। সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললে —যেখানে যাচ্ছি তারা হয়তো ভাববে ওরা এলো না। আমাদের বাড়ির ঠিকানাটা ওঁকে দিয়ে দাও, উনি ঠিক যেতে পারবেন।

সেই ভালো।

সুহাস জিজ্ঞাসা করলে—পারবেন তো যেতে? নয়তো বলুন, কাল সকালে আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব

অজিত নিরুপায়। বললে—পারব।

সুহাস তার বাড়ির ঠিকানাটা এক টুকরো কাগজে লিখে দিয়ে বললে—আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে রইলাম কিন্তু।

এই বলে জয়ার হাত ধরে হাসতে হাসতে সুহাস বেরিয়ে গেল অনিলবাবুর স্টুডিও থেকে।

রাস্তায় গিয়ে সুহাস বললে—মানুষটি বড় ভালো। তোমাদের আত্মীয়-টাত্মীয় হন নাকি?

—না।

জয়ার গলাটা কে যেন চেপে ধরলে। হে ভগবান! সুহাস যেন এর বেশী আর কিছু তাকে না জিজ্ঞাসা করে!

অজিত বেরুলো তাদের পিছু-পিছু।

অনিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—বসবেন না আর-একটু?

—আজ্ঞে না। অনেক কাজ আছে।

অনিলবাবু বললেন—আমার আজ বাড়ি ফিরতে রাত বারোটা।

—কেন?

—ছবিগুলো 'ডেভেলাপ' করে রাখতে হবে তো? কালকেই তো নিতে আসবে সব।

ছবির কথায় একটা কথা অজিতের মনে পড়লো। বললে—ছোটো মেয়েটির একটি আলাদা ছবি তুলেছি আমি। তার রসিদও নেই, টাকাও নেই।

অনিলবাবু হাসলেন, বললেন—আপনি তো আছেন।

অজিত বললে—আমি আর আছি কোথায়? কাল যদি না আসতে পারি, ছবির দুটো কপি ওই লোকটির হাতে দিয়ে দেবেন।

এই বলে অজিত ফিরে এসে দাঁড়ালো অনিলবাবুর কাছে। পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে বোধকরি তার দাম দিতে যাচ্ছিল। অনিলবাবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি এতই পাষণ্ড

ভেবেছেন ? আপনার মেয়ের ছবি আপনি তুলেছেন, আমি তার জন্যে টাকা নেবো !

সর্বনাশ ! ঝুনু যে তার মেয়ে সেকথা অনিলবাবু জানলেন কেমন করে ?

অজিত বললে—আপনি তো সর্বনেশে লোক মশাই ! ও আমার মেয়ে—আপনি জানেন ?

গম্ভীরমুখে অনিলবাবু বললেন—জানি। সব জানি।

'সব জানি।' কথাটা শুনেই অজিত যেন চমকে উঠলো। সুমুখের খালি চেয়ারটাতে বসে বললে—কি জানেন বলুন !

অনিলবাবু আবার বললেন—সব জানি।

—না না ভয় দেখাচ্ছেন কেন অনিলবাবু, কি জানেন আপনি বলুন।

অনিলবাবু বললেন—আপনাকে দেখলাম, পরিচয় হলো, বন্ধুত্ব হলো, এখানে এসে কয়েকটা দিন রইলেন, কয়েকটা ঘটনা ঘটলো, এই সব দেখে আপনাকে নিয়ে একটা গল্প আমি মনে মনে তৈরী করে নিলাম। হয়তো সত্যি যা, তার সঙ্গে সে গল্পের কিছুটা মিলবে কিছুটা মিলবে না। তা না মিলুক, তবু আমার এতেই আনন্দ। লিখতে জানি না মশাই, লিখতে জানলে হয়তো একজন গল্প-লেখক হতাম।

এই বলে অনিলবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

তবু ভালো। অজিত কিছুটা আশ্বস্ত হলো। অনিলবা তাঁর কল্পনা দিয়ে গল্প তৈরি করেছেন। সত্য ঘটনা যা—তা জানেন না। অজিত জিজ্ঞাসা করলে—ঝুনু যে আমার মেয়ে, সেও কি আপনার কল্পনা ?

—আজ্ঞে না। প্রথম যখন আপনাদের দেখা হলো, আমি তখন এইখানে দাঁড়িয়ে। ওকে আমি 'বাবা' বলে ডাকতে

শুনেছিলাম। আর তখনই আপনার গল্পটা জমে উঠলো। প্রথম যেদিন আপনাকে দেখেছিলাম পরমা সুন্দরী একটি বিধবা মেয়ের সঙ্গে, ভেবেছিলাম মেয়েটি আপনার বোন কিংবা শালী! পুরনো একটা ক্যামেরা চাইলেন। হাতে তখন আমার ক্যামেরা ছিল না। তবু বললাম আছে। আপনাদের বসালাম, চা খাওয়ালাম। কিছু মনে করবেন না অজিতবাবু; এসব করেছিলাম শুধু ওই মেয়েটিকে ভালো করে দেখবো বলে।

শুনতে মন্দ লাগছিল না অজিতের। জিজ্ঞাসা করলে—দেখে কি বুঝলেন?

—না মশাই বলবো না। ভুল হয়ে যায় তো আপনার সঙ্গে এক্ষুণি হাতাহাতি মারামারি হয়ে যাবে।

অজিত হাসতে হাসতে বললে—না-না, কিছু হবে না। আপনি বলুন তাড়াতাড়ি। শুনেই আমি চলে যাব। আমার একটা কাজ আছে।

—তাহলে সেই কাজ-টাজ সেরে এসে কাল শুনবেন।

অজিত কিন্তু 'কাল' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না। শোনবার জেদ ধরে বসলো।

অনিলবাবু বললেন—আপনাদের ভাব-ভালবাসা, আর চোখের চাউনি দেখে, কথাবার্তা শুনে মনে হলো মেয়েটি আপনার বোন নয়। পত্নীও নয়। কেন না বিধবার সাজ। তবে হ্যাঁ, উপপত্নী হতে পারে। আবার বলছি কিছু মনে করবেন না মশাই, এই উপপত্নীর কারবারটা কাশীতে বেশ ভালই চলে।

এই পর্যন্ত বলেই অজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে অনিলবাবু বললেন—রাগ করলেন নাকি?

—না না রাগ করিনি। বলুন।

অনিলবাবু আবার আরম্ভ করলেন—উপপত্নী ভাবতেই গল্প আমার

শুরু হয়ে গেল। আঃ, কি ভালই না লাগলো! হিংসে হলো আপনার ওপর। কিন্তু হিংসে হলেই বা কি করবো বলুন। গল্পের ভেতর তো আমি নেই। সেখানে আপনারাই হলেন গিয়ে হিরো-হিরোইন। গল্প চালাতে লাগলাম মনে মনে। কেমন করে আপনাদের ভাব হলো, কেমন করে চুপিচুপি পালিয়ে এলেন সেখান থেকে। এই সব আর কি! বেড়ে মজা করতে করতে—ধরা পড়তে পড়তে পড়লো না ধরা পড়তে পড়তে পড়লো না করতে করতে এনে ফেললাম কাশীতে। তারপর আপনাদের নিয়ে কত মজা করছি, মনে মনে কত খেলা খেলছি, ভাঙছি আর গড়ছি, এমন দিনে এলো আপনার ছেলেমেয়ে, এলো আপনার স্ত্রী।

এই পর্যন্ত বলে থামলেন অনিলবাবু। অজিতের মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেন। তারপর বললেন—এইখানে একটুখানি অদল-বদল করেছি। গল্পের খাতিরে করতে হয়েছে। ধরুন আপনি যেন ফটো তোলাতে এসেছিলেন একটা ফটো স্টুডিওতে! সঙ্গে ছিল সেই বিধবা মেয়েটি। হাতে ছিল একটি ব্যাগ। ফটো তোলবার আগে মেয়েটি বললে—দাঁড়াও একটু ইয়ে করে নিই। বলেই সে ঢুকলো গিয়ে মেক-আপ করবার ঘরটার ভেতর। ঢুকেই ভেতর থেকে ঘরটা দিলে বন্ধ করে; বেরিয়ে যখন এলো—তখন আর তাকে চেনবার জো নেই। সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে চমৎকার একখানি শাড়ি, হাতে সোনার চুড়ি! রূপ যেন একেবারে ফেটে পড়ছে! ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হেসে চোখের ইসারায় আপনাকে সে ডেকে নিয়ে গেল ঘরের ভেতরে। জিজ্ঞাসা করলে, কেমন? এবার হয়েছে তো! আপনি বললেন—হয়েছে। তারপর দুজনে হাসতে হাসতে মনের আনন্দে যেই বসতে যাবেন ফটো তোলার জায়গায়, অমনি 'বাবা' বলে ছোট মেয়েটা কোত্থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আপনার গায়ের ওপর। আপনি একেবারে হকচকিয়ে

গিয়ে সুমুখে তাকিয়ে দেখেন ফুটফুটে একটি ছেলে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার মা! মুখের হাসি আপনাদের মুখেই মিলিয়ে গেল, কেমন করে, কোত্থেকে তারা এখানে এলো—সেকথা জিজ্ঞাসা করবার মত ভাষা খুঁজে পেলেন না। বাস, এই পর্যন্ত ভেবেছি। এইবার চলবে জগঝম্প!

অজিত বললে—সেইটে, বলুন শুনি।

—আজ্ঞে না। সেটা এখনও বলবার মত হয়নি। এক্ষুণি বসে বসে ভাবছিলাম। ভেবে ভেবে ঠিক করি, তারপর বলবো আপনাকে।

অজিত বললে—আপনি তো বেশ লোক মশাই! মনে মনে এত ভেবে ফেলেছেন, অথচ আমাকে একটিবার জিজ্ঞাসাও করেননি।

অনিলবাবু বললেন—বা-বা-বা-বা, আপনাকে জিজ্ঞাসা করে মরি আর কি! আপনি যদি বলে বসেন—মেয়েটি আমার উপপত্নী কেন হবে, ও আমার এক দূর সম্পর্কের পিসীমা হয়। ওকে আমি কাশী নিয়ে এসেছি—তীর্থ করবার জন্যে! তখন? তখন আমার গল্পটি ভেঙে চুরমার হয়ে যেতো তো? কাজেই ওসব আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করি না মশাই, জিজ্ঞাসা করি আমার মনকে! আপনাকে এ গল্প আমি বলতাম না। বললাম শুধু আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে বলে!

অজিতের সত্যিই তাড়া ছিল। সুষমার কাছে আজ একবার সে যাবেই। তারপর ইন্দুমতীর কাছে এসে খেতে হবে রাত্রে।

বললে—পরে এসে শেষটা শুনে যাব! তারপর বলবো সত্যি যা, তার সঙ্গে আপনার মনের কল্পনা কতখানি মিলেছে।

এই বলে অজিত বেরিয়ে পড়লো।

বেরিয়েই দেখে রাস্তার ওপর বীরেন দাঁড়িয়ে।

—তুমি কি এখনও বাড়ি যাওনি ? ঝুমু কোথায় ?

বীরেন বললে—ঝুমুকে বাড়িতে রেখে এলাম।

—এখানে আবার কি জন্যে এলে ? অজিত জিজ্ঞাসা করলে।

—ছবিগুলো কখন পাবো ?

—কাল তুমি বেলা বারোটা-নাগাদ এসো।

—কাল তাহলে আমাদের যাওয়া হচ্ছে না ?

জবাব দিতে গিয়ে অজিত খুব ভাবনায় পড়লো।

অজিতকে চুপ করে থাকতে দেখে বীরেন আবার জিজ্ঞাসা করলে—তুমি যাবে তো আমাদের সঙ্গে ?

অজিত বললে—না, কাল রাত্রের ট্রেনে তোমরা চলে যাও। আমি কয়েকটা দিন পরে যাব।

অজিতকে এগিয়ে যেতে দেখে বীরেন জিজ্ঞাসা করলে—তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

অজিত ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—আমি যেখানেই যাই না কেন, তুমি বাসায় ফিরে যাও।

বীরেন বললে—তবে যে ইন্দু বললে তুমি আজ রাত্রে খাবে আমাদের ওখানে ?

—হ্যাঁ, খাবো। আমি আসছি। তুমি যাও।

এই বলে অজিত হনহন করে এগিয়ে গেল একটা গলির দিকে। গলির মুখে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখলে, বীরেন তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? যাও !

বীরেন বললে—আমি জানি তুমি কোথায় যাচ্ছ।

অজিত কি জানি কেন, হেসে ফেললে। বললে—তা বেশ, জানো তো জানো—যাও তুমি বাসায় ফিরে যাও, ঝুমুর মাকে গিয়ে বল আমি আসছি এক্ষুণি।

বীরেন তবু এগিয়ে গেল তার কাছে। বললে—আমি তাকে কখনও চোখে দেখিনি মাইরি, তাকে একবার দেখাবে না? আমি এই তোমার হাতে ধরে বলছি মাইরি আমি ইন্দুকে কিচ্ছু বলবো না, শুধু একবার দেখবো আর চলে আসবো।

অজিত বললে – না, তাকে দেখতে হবে না, তুমি যাও।

বীরেন তবু তাকে অনুনয় করতে ছাড়লে না।

—জন্মের সাধ একবার দেখাবে না তাকে? শুনেছি সে খুব সুন্দরী। আমি একটিবার শুধু দেখেই বাস—তাছাড়া কালকেই যখন চলে যাচ্ছি—চল আমি তোমার সঙ্গেই যাই।

অজিত এবার একটু জোরে-জোরেই বললে—তা হয় না, বীরেন, তুমি জ্বালিয়ো না।

বীরেনের বোধহয় রাগ হলো। বললে—আচ্ছা বেশ, দেখাবে না যখন, তখন ফিরেই যাচ্ছি। তুমি যাও।

এই বলে সে সত্যিই ফিরলো।

অজিত তখন নিশ্চিন্ত মনে কাশীর সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকার গলির পর গলি পেরিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়ালো সুষমার বাড়ির দরজায়।

দোরের কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে খুক করে একটা আওয়াজ হলো। তারপর কাশীর বাড়ির দরজা যেমন করে খোলে, তেমনি করে খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো অজিত। নীচেটা অন্ধকার। সুষমা বোধহয় দোতলায় আছে। আলোর দরকার হলো না। এ বাড়ির সবই তার চেনা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে, লণ্ঠন হাতে নিয়ে আধা-বয়েসী একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো বারান্দার ওপর।

—কে আপনি? মা তো বাড়িতে নেই!

অজিত জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় গেছে?

মেয়েটি বললে—দিদিমণি এসে কোথায় কোন্ আশ্রমে নিয়ে গেল।

অজিত বললে—দিদিমণি—মানে সুহাসের দিদি ?

অপরিচিত মানুষ দেখে মেয়েটি এতক্ষণ বোধ করি একটুখানি বিচলিত হয়েছিল, এবার যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললে—বসবেন আপনি ? ঘর খুলে দেবো ?

কী যে করবে অজিত ঠিক বুঝতে পারলে না। একবার ভাবলে—একখানা চিঠি লিখে রেখে যায়। আবার ভাবলে—যাক, মাধবী সঙ্গে আছে। এখানে বেশিক্ষণ থাকাও নিরাপদ নয়।

অজিত জিজ্ঞাসা করলে—কখন গেছে তারা ?

—এই তো সন্ধ্যেবেলা। যেতে উনি চাইছিলেন না। মেয়ে শ্বশুর-বাড়ি চলে গেছে, মন খারাপ। দিদিমণি জোর করে টেনে নিয়ে গেল।

অজিত বললে—তুমি বুঝি সুহাসের বাড়ির—

কথাটা শেষ হলো না। মেয়েটি তার আগেই বললে—হ্যাঁ বাবা, আমি বহুৎ দিন আছি ওই বাড়িতে। মা একা থাকবে, তাই দাদাবাবু বললে—তুই রান্না বাজার করে দিবি আর থাকবি মাকে আগলে আগলে। কাশী তো জায়গা ভাল নয় বাবু।

অজিত বললে—আজ আমি চললাম। আবার কাল আসবো। সুষমাকে বলে দিও।

মেয়েটি বললে—সুষমা বুঝি দাদাবাবুর শাশুড়ীর নাম ?

অজিত বললে—হ্যাঁ।

বলেই সে আবার ফিরে দাঁড়ালো, বললে—না, কিছু বলতে হবে না। কাল আমি আসবো।

মেয়েটি বললে—না না সে কি রকম কথা ? বলতে আমাকে হবেই। আপনার নামটি বলে যান, আর কখন আসবেন বলে যান। তাহলে সেই সময় থাকতে বলবো মাকে !

বিপদে পড়লো অজিত। সুষমা আসবামাত্র মাধবীর সামনেই হয়তো তাকে সব কথা বলবে। মাধবী হয়তো জিজ্ঞাসা করবে—লোকটি কে? সুষমা জবাব দিতে পারবে না। হয়তো বলবে, যিনি তাদের এখানে নিয়ে' এসেছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি তো দেশে চলে গেছেন। অথচ দেশে যে তার যাওয়া হয়নি—সুহাসকে যেকথা সে বলেছে, সুষমা তা জানে না। কি বলতে কি বলে বসবে, তার চেয়ে কাজ নেই—

—ওগো মেয়ে, শোনো! অজিত বললে—সুষমাকে বোলো একজন লোক এসেছিল, সে বলে গেছে কাল সন্ধ্যেবেলা আসবে।

মেয়েটি বললে—লোক বললে যদি চিনতে না পারে?

ওরে বাবা, এ তো সহজ মেয়ে নয়। অজিত আবার বললে—ঠিক চিনতে পারবে। কিন্তু ছাখো, তোমার মাধবী দিদিমণি যখন চলে যাবে, সুষমা যখন একা থাকবে, তখন বলো।

মেয়েটি বলে উঠলো, ওমা সে কি কথা গো! দিদিমণির কাছে বলবো না?

অজিত তখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে। কথাটা ধক্ করে তার বুকে গিয়ে বাজলো। ছি ছি, কথাটা তার না বললেই হতো। মাধবীর সামনে বলবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু তার সামনে বলতে বারণ করার কথাটাও যদি বলে বসে, তাহলেই হবে সুষমার বিপদ।

অপরাধী মন এমনি করেই ধরা পড়ে।

যা হয় হবে। অজিত আর কিছু ভাবতে পারলে না।

অজিত ফিরে এলো ইন্দুমতীর কাছে।

এসে দেখলে, বীরেন তখনও ফেরেনি।

বড় সাধ ছিল তার সুষমাকে দেখবার। দেখতে পেলে না বলে হতভাগা হয়ত রাগ করেছে। হয়ত বা সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে

বেড়াচ্ছে, কিংবা হয়ত মনের দুঃখে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে চুপ করে বসে আছে।

কিন্তু এ কী অদ্ভুত পরিবর্তন ইন্দুমতীর!

ঝুনু টুনু দু'জনকেই বোধ করি খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। তারপর নিষ্ঠাবতী মেয়েরা যেমন করে দেবতার ভোগ রান্না করে ঠিক তেমনি করে ইন্দুমতী তার ছোট হেঁসেলটিতে বসে বসে তখনও রান্না করছে। আয়োজন উপকরণের একান্ত অভাব, পোড়া মাটির কয়েকটা বাসন, আর শুকনো শালের পাতা। লোহার চাটু খুন্তি হাতা কড়াই এখানে এসে কিনেছে।

ঘরের ভেতর জ্বলছিল মাটির প্রদীপ। একপাশে পরিপাটী করে বিছানা পেতেছে অজিতের জন্যে। বিছানার চাদর নেই, তাই বোধহয় নিজেরই একটি কাচা শাড়ি পেতে দিয়েছে বিছানার ওপর। এদিকে একটা মাদুরের ওপর শুইয়েছে ছেলেমেয়েকে।

নতুন কেনা লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো ইন্দুমতী। লণ্ঠনটি অজিতের কাছে নামিয়ে দিতে গিয়ে চোখোচোখি হয়ে গেল দু'জনের। ইন্দুমতী হেসে ফেললে। হেসেই সে চলে যাচ্ছিল। অজিত বললে—আলোটা রেখে চলে যাচ্ছ যে? অন্ধকারে কাজ করবে কেমন করে?

ইন্দুমতী বললে—কাজ আমার হয়ে গেছে। কেরোসিনের একটা কুপি জ্বালিয়েছি রান্নাঘরে। এখন খাবে?

অজিত বললে—দিতে পার।

লণ্ঠনটা আবার তুলে নিয়ে ইন্দুমতী বললে হাত পা ধোবে এসো!

উঠানের একপাশে স্নানের ঘর। ইন্দুমতী অজিতকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে জল ঢেলে দিলে। অজিত বললে—সরো না, আমি নিজেই নিচ্ছি।

ইন্দুমতী সরলোও না, তার কথার কোনও জবাবও দিলে না,

শুধু বিষণ্ণ তুটি চোখ তুলে একটি বার তাকিয়েই আবার জল ঢালতে লাগলো।

বীরেন এলো। বললে—এই যে, তুমি আগেই এসে গেছ!

বলেই সে পেয়ারাতলায় খাটিয়ার ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। বললে—কাশী বড় মনোরম জায়গা মাইরি, এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না।

কেউ তার সঙ্গে কোনও কথা বলছে না দেখে সে আপন মনেই বলতে লাগলো—একটা ফটো তোলাতে চাইলাম, তাও তো হলো না।

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অজিত বললে—ফটো তোমার হয়েছে তো!

—ধেৎ! মনের মত হয়নি।

—কাল দেখো, তারপর বলো।

বীরেন বললে—তাই দেখবো।—আর কিছু আনতে হবে তো বল্ এই সময় এনে দিই।

ইন্দুমতী বললে—না। কিছু আনতে হবে না।

জল ছিটিয়ে হাত দিয়ে মুছে ইন্দুমতী ঠাঁই করে দিলে অজিতের। আসনের অভাবে তু'তিন ভাঁজ করে ছেঁড়া একটা চট পাতলে। তারপর শুকনো শালের পাতায় আর মাটির খুরিতে খাবার দিতে এসে লজ্জায় যেন মরে গেল।

—কি আর করবে, এইতেই খাও। বাড়ি থেকে আনিনি তো কিছু।

অনেক কিছু খাবার করেছে ইন্দুমতী। খানিকটা রাবড়ি পর্যন্ত আনিয়ে রেখেছে অজিতের জন্যে।

—ওরে বাবা, এত সব কেন?

আবার সেই বিষণ্ণ ম্লান চোখ তুটি তুলে এমন ভাবে তাকালো ইন্দুমতী—অজিতেরই লজ্জা হলো। আর কিছু সে বললে না।

কিন্তু আশ্চর্য, অজিতের মনে হলো, খেয়ে সে এমন তৃপ্তি অনেকদিন পায়নি। ইন্দুমতীও বোধ করি এমন নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে অনেকদিন খাওয়ায়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর বীরেন শুয়ে রইলো উঠোনের সেই খাটিয়ায়, আর তারা দুই স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে রইলো ঘরের ভেতরে।

প্রতিদিনের অভ্যাসমত রাত্রি প্রভাতের আগেই পাঁড়েজি বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

তারপরেই ঘুম ভাঙলো টুনুর।

টুনুই জাগিয়ে দিলে তার বাপ-মাকে।

ইন্দুমতী জড়িয়ে ধরলো অজিতকে। বললে—আবার কবে তোমার দেখা পাব জানি না। তুমি আজ আমার একটি কথা রাখবে ?

অজিত বললে—কি কথা বল !

—আমি গঙ্গায় চান করবো, তুমি আমাকে দাঁড়িয়ে দেবে ?

অজিত বললে—তাহলে আমিও স্নান করিগে চল।

ঝুনু-টুনু রইলো বীরেনের কাছে। ইন্দুমতী আর অজিত গেল স্নান করতে।

বীরেন বললে—তাড়াতাড়ি আসবি কিন্তু।

ইন্দুমতী বললে—দুধটা নিয়ে রেখো। আমি এসে চা করে দেবো।

কিন্তু ফিরতে তাদের দেরি হলো।

গঙ্গায় স্নান করে ইন্দুমতী বললে—বিশ্বনাথের মন্দিরে যেতে হবে একবার।

—এখন কেন ? পরে যেও।

—না, এক্ষুণি যেতে হবে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে।

—আমাকে সঙ্গে নিয়ে কেন ?

—বা-রে, মা-অন্নপূর্ণাকে দেখবো না ? এই যে এত বড় শহরে তোমার দেখা পেলাম –এ তো শুধু মায়ের জন্যে !

ইন্দুমতী বলতে বলতে চললো–কাশীর মা-অন্নপূর্ণার নামই শুনেছিলাম শুধু। মার যে এত দয়া, মা যে এত জাগ্রত—সেকথা জানলাম এখানে এসে। রোজ কেঁদে কেঁদে আমি মাকে ডেকেছি, তাকে বলেছি, তোর রাজত্বে এসে আমি এমনি করে ফিরে যাব মা ? একটিবার শুধু এনে দে আমার কাছে। তারপর ছাখো দাদা জোর করে আমাকে বললে, ফটো তুলবি আয়। যেতে আমি চাইনি, কিন্তু কেন গেলাম ? কে আমাকে নিয়ে গেল ?

বলতে বলতে ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপতে লাগলো ইন্দুমতীর। দুচোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে এলো। আর সে একটি কথাও বলতে পারলে না।

মন্দিরের কাছে যখন এলো তখন অনেকটা সে সামলে নিয়েছে। হঠাৎ কি যেন তার মনে পড়লো ! বললে—ভিজে কাপড়ের পুঁটলিটা তুমি ধর, আমি একটা জিনিস কিনে আনি।

অজিত বললে—কি জিনিস বল না, আমি এনে দিচ্ছি।

ইন্দুমতী বললে- না তুমি পারবে না।

এই বলে পুঁটলিটা সে অজিতের হাতে ধরিয়ে দিয়ে একরকম ছুটেই চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে ফিরে এলো কিছু ফুল আর বেলপাতা হাতে নিয়ে।

—এগুলো কি তুমি গাছ থেকে তুলে আনলে নাকি ?

—কেন বল তো ?

—এত দেরি হলো তাই বলছি।

ইন্দুমতী একটুখানি হাসলে। হেসে বললে—দাঁড়াও।

অজিত দাঁড়াতেই ইন্দুমতী গড় হয়ে তাকে একটি প্রণাম করলে।

—কি করছ ? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

ইন্দুমতী বললে—না, পাগল হইনি।

বলেই সে মন্দিরের গায়ে হাত রেখে বললে, এই আমি মন্দিরের গায়ে হাত দিয়ে মা-অন্নপূর্ণাকে সাক্ষী রেখে বলছি—তোমাকে আমি আর কিছু বলব না। যা করলে তুমি সুখে থাকো তাই তুমি কর। আমার সুখশান্তি মা দেখবে।

এই বলে সে হাসতে হাসতে মন্দিরে গিয়ে ঢুকলো।

খানিক পরে যখন ফিরে এলো, দেখা গেল তার বুকের কাপড়টা রক্তে লাল হয়ে গেছে, দুহাতে টকটকে কাঁচা রক্ত মাখানো।

অজিত চমকে উঠলো - একি ? এত রক্ত কেন ?

—ও কিছু না। চল।

বলে হাসতে হাসতে এগিয়ে যাচ্ছিল ইন্দুমতী। অজিত তাকে থামালো। এগিয়ে গিয়ে বুকের কাপড়টা একটুখানি ফাঁক করে দেখলে—সেইখান থেকে রক্ত তখনও গড়াচ্ছে।

বুঝতে অজিতের দেরি হলো না। এই সব সরল বিশ্বাসী মেয়েরা অনেক সময় বলে—'তোকে আমার বুকের রক্ত দিয়ে পূজো করব মা—আমার যদি মনস্কামনা পূর্ণ হয় !'

তাই ইন্দুমতী বোধহয় মা-অন্নপূর্ণার কাছে মানত করেছিল তার বুকের রক্ত।

অজিত জিজ্ঞাসা করলে—তা হঠাৎ এ মানত করতে গেলে কেন ?

—কী আর আছে আমার মাকে দেবার মত ? মা আমার এত উপকার করলেন --

অজিত আবার জিজ্ঞাসা করলে—কী দিয়ে কাটলে বুকটা ?

ইন্দুমতী বললে—যা দিয়ে তোমরা দাড়ি কামাও! সেই তো আনতে গিয়েছিলাম তখন।

অজিত দেখলে ইন্দুমতীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বুকের রক্ত দিয়ে মার কাছে সে তার কথা রাখতে পেরেছে তাইতেই সে খুশী। মুখে তার পরম পরিতৃপ্তির হাসি!

হাসতে হাসতে বললে—দাও ভিজে কাপড়গুলো আমার হাতে দাও।

কাপড়ের পুঁটলিটা সে একরকম কেড়েই নিতে যাচ্ছিল, অজিত দিলে না। বললে—চল।

গলি-পথ। পাশাপাশি যাচ্ছে দুজনে।

অজিত বললে—তা এ-মানতটি কখন করলে শুনি?

ইন্দুমতী মুখ ফিরিয়ে একবার তাকালে অজিতের মুখের দিকে। ঠোঁটের ফাঁকে ফিক করে একটু হাসলে। কোনও কথা বললে না।

—কখন মানত করলে—বল না শুনি!

—সে তোমার শুনে কাজ নেই।

—মনস্কামনা কি তোমার পূর্ণ হয়েছে? আমি তো রইলাম এখানে। তোমরা তো আজই দেশে ফিরে যাচ্ছ!

ইন্দুমতী মাথা হেঁট করে তার বুকের দিকে একরার তাকালে। কাটা জায়গাটায় কাপড়টা চাপা দিয়ে আরও খানিকটা রক্ত কাপড়ে লাগালে। তারপর ধীরে ধীরে বললে—আমি তো মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি তোমাকে কিছু বলবো না। মা যা করবে তাই হবে।

পাঁড়েজির বাড়িতে যেতে গলি থেকে বেরিয়ে ডানদিকে মোড় ফিরতে হয়। ইন্দুমতী সেইদিকে যেতে চাইছিল, অজিত যেতে দিলে না। বললে—না, এইদিকে এসো।

—এদিকে কোথায় ?

অজিত কোনও কথা বললে না। তার নজর তখন অন্যদিকে। পথের ধারে সে দেখেছে - কোন ডাক্তারখানা খোলা আছে কি না।

পাওয়া গেল একটি ছোট ডাক্তারখানা। ইন্দুমতীকে নিয়ে অজিত গেল সেখানে। বললে—একটু টিনচার বেনজুইন দিতে পারেন ? ক্ষুরের পাতিতে একটা জায়গা কেটে গেছে।

লোকটি বোধহয় কম্পাউণ্ডার। মুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের। তক্ষুণি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—কই দেখি !

কিছুতেই দেখাবে না ইন্দুমতী। বললে—না না ওর কথা শুনছেন কেন ? আমার কিছু হয়নি।

—কিছু হয়নি বললে তো চলবে না মা। এই থেকে টিটেনাস পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। জ্বালাটালা করবে না। একটুখানি চিনচিন করবে শুধু।

বলতে বলতে ভদ্রলোক ডেটল, আইডিন, বেনজুইন, তুলো—সব কিছু এনে ফেললেন, বললেন দেখি কোন্ পায়ে কেটেছে দেখি। একটু দেখেশুনে পথ চলতে হয় মা। আজকালকার মানুষগুলো বড় অবিবেচক।

অজিত বললে – না পায়ে নয়। এই দেখুন।

বলে সে একরকম জোর করেই ইন্দুমতীর বুকের কাপড়টা একটুখানি সরিয়ে দিলে।

কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোক প্রথমে একটু অবাক্ হলেন বই কি ! তারপর বললেন—বুঝেছি।

ডেটল দিয়ে পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে 'সিল্' করে দিলেন জায়গাটা। বললেন - মেয়েছেলের কঠিন ব্যারাম-ট্যারাম হলে

মেয়েরা এইরকম করে। এ একরকম পাগলামি মা, এসব ছেলেমানুষি। যাক, আর কোনও ভয় নেই।

অজিত বললে—আপনি আমার খুব উপকার করলেন।

—এর নাম যদি উপকার হয়, তাহলে পরের বিপদে যারা জীবন দিয়ে দেয় তাঁদের কি বলবে বাবা? যাও বাড়ি যাও।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে তারা বাড়ি এলো।

বীরেন তো রেগে টং!

—এখনও চা খাইনি আমি! তোদের বেশ আক্কেল যা-হোক!

ইন্দুমতী বললে—নিজে করে নিলেই পারতিস!

—পারতাম তো! কিন্তু এই যে!

টুনুকে দেখিয়ে দিয়ে বললে—তোর এই দস্যি ছেলে কি আমাকে তিষ্ঠোতে দিয়েছে নাকি?—যা রে যা তোর মা এসেছে, এবার আমাকে রেহাই দে।

এই বলে টুনুকে সে তার মার কাছে ঠেলে দিচ্ছিল।

ইন্দুমতী বললে—ধর্ না দাদা একটুখানি! আমি উনুন ধরিয়ে চা করবো না! ঝুনু কি করছে?

বীরেন বললে—ও সংসার পেতেছে।

দেখা গেল ঝুনু তার খেলনা সাজিয়ে ধুলোবালি নিয়ে আপন মনেই খেলা করছে।

অজিত এগিয়ে এলো। বললে—টুনু, এসো আমার কাছে।

দুধ গরম করে টুনুকেও খাওয়ানো হলো ঝুনুকেও খাওয়ানো হলো। তারপর চায়ের বাটিটা অজিতের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে ইন্দুমতী বললে—এবার বল—তুমিই বা কি করবে আর আমিই বা কি করবো।

অজিত বললে—কাল তো তোমাকে বলেছি সেকথা। তোমরা আজ রাত্রির ট্রেনে চলে যাও। আমি কয়েকটা দিন পরে যাব।

—দিনের বেলা এখানে খাবে তো ?

—না, আজ আমার এক জায়গায় খাবার নেমতন্ন আছে।

—এক জায়গায় বলছো কেন, বল সুষমার কাছে।

—না না, সুষমার কাছে নয়। অন্য জায়গায়।

সুষমার মেয়ের যে বিয়ে হয়েছে সেকথা আর বললে না অজিত। কথায় কথা বাড়বে— সুতরাং না বলাই ভাল।

—তুমি কি তাহলে এক্ষুণি চলে যাবে ?

—একটু পরে যাব।

—তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না ?

অজিত একটু ভাবলে। এখন সে যাবে সুহাসের বাড়ি। সেখানে খেয়েদেয়ে চলে আসবে সে সুষমার কাছে। বিকেলে মাধবী আসতে পারে, কাজেই সে সময় সেখানে সে থাকবে না। তারপর আবার যাবে রাত্রে।

সুষমাকে আজ সে বলবে সব কথা।

অজিত বললে— তোমরা এখান থেকে বেরুবার আগে আমি আর একবার অসবো। আমার ব্যাগটা এইখানে রইলো। সেই সময় নিয়ে যাব।

সেই ব্যবস্থাই হলো।

ইন্দুমতী আবার বললে—বলেইছি তো তোমাকে আমি কিছু বলবো না। তুমি যেমন করে সুখে থাকতে চাও তেমনি করে থাকো।

বীরেন ছটফট করছিল ফটো আনবার জন্যে।

অজিতের সঙ্গেই সে বেরিয়ে গেল

স্টুডিওতে অনিলবাবু ছিলেন না। ছিল শম্ভু।

অজিতকে দেখেই শম্ভু বলে উঠলো—ছোট একটি মেয়ের ছবি বড় সুন্দর তুলেছেন অজিতবাবু।

বীরেন বললে—তা তো তুলবেই। কিন্তু আমার ফটোটা উঠেছে কি ?

শম্ভু কি যেন বলতে যাচ্ছিল—অজিত চোখ টিপতেই সে অন্য কথা বললে। বললে—আপনার ছবিটা তেমন সুবিধের হয়নি।

—জানি হবে না।

বলেই সে মুখ ভার করে একটুখানি চুপ করে থেকে বললে—আমি আবার তোলাবো।

অজিত বললে—সে ছবি তো এইখানেই পড়ে থাকবে। তোমরা তো এখান থেকে চলে যাচ্ছ আজ সন্ধ্যেবেলা।

বীরেন বলে বসলো—যাব না।

বলেই সে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়লো চেয়ারের ওপর।

বিশ্বাস নেই বীরেনকে। ছবির জন্যে হয়ত সে থেকেও যেতে পারে।

অজিত তখন হাসতে হাসতে তার ফটো দুখানি বের করে বীরেনের হাতের কাছে ফেলে দিয়ে বললে—নাও তাহলে ছাখো কি রকম সুন্দর ছবি হয়েছে।

ছবি দেখে আনন্দে বীরেনের চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল। মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না।

ঝুনুর ছবিখানি অজিত দেখছিল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছে তার ফটো। সেগুলিও বীরেনের হাতে দিয়ে অজিত বললে, যাও তুমি এবার বাড়ি চলে যাও। আজ সন্ধ্যায় তোমরা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবে। বুঝলে ?

বীরেন জিজ্ঞাসা করলে, তুমি যাবে না আমাদের সঙ্গে ?

—না।

বীরেন বললে—ধেৎ তেরি, তাহলে এত কষ্ট করে মিছেই এলাম আমরা !

অজিত বললে—সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি যাও।

বাধ্য হয়ে উঠতে হলো বীরেনকে।

অজিত দেখলে, সুহাস আর জয়ার ছবি দুটো ভারি সুন্দর হয়েছে। তিন কপি করে ছ'কপি ছবি একটি খামের ভেতর পুরে অজিত বললে—এগুলো আমি নিয়ে গেলাম শম্ভু, আমি ওইখানেই যাচ্ছি।

বলেই ছবি নিয়ে অজিত বেরিয়ে গেল।

ফটোগুলি নিয়ে মনের আনন্দে বীরেন বাসায় এলো একেবারে নাচতে নাচতে।

কাগজের খামটি দেখিয়ে ঝুনুকে বললে, এটা বল দেখি কী ?

ঝুনু যখন বলতে পারলে না, তখন সে গেল ইন্দুমতীর কাছে। প্রথমে দেখালে নিজের ছবিটি !

ইন্দুমতী বললে—মনস্কামনা পূর্ণ হলো তো এবার ? ফটো তোলাব ফটো তোলাব করে যেন মরে যাচ্ছিলি !

বীরেন বললে—দ্যাখ, ইন্দু, বেশী চেঁচাস্‌নে। এই ফটো তুলতে গিয়েছিলাম বলে দেখা হয়েছিল অজিতের সঙ্গে—

ইন্দুমতী স্বীকার করলে সেকথা।

এইবার ঝুনুর ছবি।

ছবি তিনটে ইন্দুমতীর হাতে দিয়ে বীরেন বললে—এই ছবি তুলেছে ঝুনুর বাবা। ও যে এত সুন্দর ছবি তুলতে পারে তা জানতাম না।

তন্ময় হয়ে ছবিখানি দেখতে দেখতে ইন্দুমতী স্বামীর প্রশংসা শুনে চোখ তুলে বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললে—ও সব পারে।

বীরেন বললে—সবারই হলো, শুধু তোর আর ওই বাচ্চাটার ফটো হলো না।

ঝুনু তার ফটো দেখবার জন্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দুমতী তার হাতে ফটোটি দিয়ে বললে—আমার আর ফটোতে কাজ নেই।

বলেই সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বীরেন বললে—তাড়াতাড়ি যাহোক কিছু রান্না করে নে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েই যেতে হবে এক জায়গায়।

ইন্দুমতী ভেবেছিল দাদা বুঝি স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবার কথা বলছে।

—সে তো সেই সন্ধ্যেবেলা। এখন কি?

বীরেন বললে—সন্ধ্যেবেলা তো ইস্টিশানে যেতে হবে। তার আগে দুপুরবেলা আর একটা কাজ সারতে হবে।

ইন্দুমতী জিজ্ঞাসা করলে—আবার কি কাজ?

—আছে আছে কাজ আছে।

বলতে বলতে বীরেন এসে বসলো রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে। বললে—তোর মত বোকা মেয়ে আমি দুটি দেখিনি। কাশী নিয়ে এলাম তোকে, অজিতের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়ে দিলাম। তারপর যেই দুটো হেসে কথা বলেছে আর অমনি গলে জল হয়ে গেলি?

কথাটা ইন্দুমতীর ভাল লাগলো না। বললে—তুই থাম দাদা। তোকে আর অত মোড়লি করতে হবে না। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা কর।

—এই রে! একশো টাকা খরচ করে তাহলে এলি কি জন্যে শুনি? অজিত যেমনি বললে—তোমরা এখন যাও, আমি এর পরে যাব, অমনি সেই কথা তুই বিশ্বাস করে বসলি?

ইন্দুমতী বললে—আমার যা খুশী আমি তাই করবো। তোর কি?

বীরেন কিন্তু নিজের জেদ ধরে রইলো।

—গ্যাখ, বাঁচতে যদি চাস তো আমার কথা শোন!

কী শুনবো?

বীরেন বললে—আমি জানি ও 'পুরুষ ব্যাটাছেলে, ও সহজে যাবে না। ওকে নিয়ে যেতে হলে একটা কৌশল করতে হবে।

—কি কৌশল করতে হবে শুনি?

—চট করে খেয়েদেয়ে তোকে আমার সঙ্গে বেরুতে হবে। কাল কি কষ্টে যে অন্ধকারে চুপি চুপি চোরের মত অজিতের পিছু পিছু গিয়ে মাগীর বাড়িটা দেখে এসেছি তা তুই কেমন করে জানবি?

ইন্দুমতী ম্লান একটু হাসলে। বললে—তুই দেখলি সুষমাকে?

—সুষমা ওর নাম বুঝি?

—হ্যাঁ। দেখলি ওকে?

বীরেন বললে—দেখবো কেমন করে? অজিত আমাকে কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে যে! বললাম—আচ্ছা দাও তাড়িয়ে, আমিও বাবা চালাক ছেলে, ঠিক পিছু পিছু গিয়ে বাড়িটা দেখে এসেছি। নে চটপট খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে দে। অজিত এই সময় অন্য বাড়িতে গেছে নেমন্তন্ন খেতে। ও এসে পড়লে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

ইন্দুমতী এতক্ষণে বোধহয় বুঝতে পারলে তার দাদার মতলব। বললে—কী তুই বলতে চাস খুলে বল দাদা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোর কথা।

বীরেন বললে—কিছু বুঝতে হবে না। আমি যা প্রোগ্রাম করছি, ঠিক ঠিক তাই করে যা, ব্যস, দেখবি কাজ হাসিল হয়ে গেছে।

—কি তোর প্রোগ্রাম শুনি?

বীরেন বললে—আমার সঙ্গে যাবি সেই মেয়েটার কাছে। তোকে আর আমাকে দেখলেই তো বাছাধনের পিলে চমকে উঠবে।

—পিলে চমকাবার মেয়ে সে নয় দাদা। মেয়েটার যেমন চেহারা, তেমনি—

কথাটাকে শেষ করতে দিলে না বীরেন। বললে—আরে রেখে দে তোর চেহারা! অমন কত চেহারা দেখেছি। বলবি এই আমার দাদা। বলবি—দাদা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ভাল চাও তো আমার স্বামীকে তুমি ছেড়ে দাও, নইলে দাদা তোমাকে সহজে ছাড়বে না।

ইন্দুমতী বললে—বুঝেছি। জিনিসপত্র তুই বাঁধাছাঁদা কর। রান্না আমার হয়ে গেছে। পাঁড়েজি বউ-এর হাতে ভাড়ার টাকাটা দিয়ে দে। আর কোথাও কারও ধার-দেনা রাখিসনি তো?

বীরেন বললে—না না একটি পয়সাও কেউ পাবে না।

—দিনরাত তো ছাগলের মত পান চিবোচ্ছিস, পানের দোকানে ধারফার করিসনি তো?

—না। চার আনা পাবে, যাবার সময় দিয়ে যাব।

ইন্দুমতী বললে—যা তুই এক্ষুণি দিয়ে আয়। একটি পয়সা কারও যেন বাকি না থাকে।

বীরেন বললে—দেরি হয়ে যাবে বলছি, তবু বলে এক্ষুণি দিয়ে আয়। আমি চান করতে যাচ্ছি, তুই আমাকে ভাত দে। ঝুনু, চট্ করে খেয়ে নে।

ইন্দুমতী বললে—কেন মিছেমিছি ছট্‌ফট্ করছিস দাদা! আমি যাব না সুষমার কাছে।

—যাবি না?

—না।

—এখনও বলছি আমার কথা শোন। ভাল চাস তো চল, নইলে আর কখনও ফিরে পাবি না অজিতকে।

ইন্দুমতী তার কথার জবাব দিলে না। আপন মনেই নিজের কাজ করতে লাগলো।

—চুপ করে রইলি যে? কি ভাবছিস?

ইন্দুমতী বললে—কিছু ভাবিনি দাদা, আমি যাব না।

—এই রে! তুই দেখছি মরবি শেষ পর্যন্ত।

—মরি মরবো, তোকে সেসব কথা ভাবতে হবে না।

এই বলে ইন্দুমতী একটু থেমে আবার বললে—সুষমাকে দেখবার জন্যে তুই ছট্‌ফট্ করছিস আমি জানি। তা যা না, ঠিকানা যখন পেয়েছিস, দেখে আয়। দিদি-টিদি বলে প্রণাম-ট্রনাম করে আয়।

ইন্দুমতী মুখ টিপে টিপে হাসছিল—বীরেন দেখতে পেলে। বললে—একটি চড়ে তোর মুণ্ডুটি আমি ঘুরিয়ে দেবো ইন্দু, ঠাট্টা করিসনে বলছি।

বলতে বলতে গায়ের জামাটা সে খুলে ফেললে। বললে—দে তেল দে, চানটা করে ফেলি। গেলি না, খুব খারাপ করলি কিন্তু।

চৌদ্দ

অজিতকে দেখে সুহাস খুশী হলো খুব। ডাকলে, জয়া দেখে যাও কে এসেছে।

খানিক পরে জয়া বেরিয়ে এলো হাসতে হাসতে। এসে একটি প্রণামও করলে অজিতকে। প্রণাম করেই আবার ভেতরে চলে গেল। মুখে একটি কথাও বললে না।

এরকম ব্যবহার সে করেনি বিয়ের আগে। কাছে এসেছে, হেসেছে, কথা বলেছে; কিন্তু বিয়ের পর প্রথম যখন তার সঙ্গে দেখা হলো অনিলবাবুর ফটো-স্টুডিওর ভেতর, তখনও তার চোখের দৃষ্টিতে এমনি একটা সলজ্জ সংকোচ অজিত লক্ষ্য করেছিল। তখন ভেবেছিল বিয়ের কনে, তার ওপর সুহাস সঙ্গে রয়েছে, তাই বোধহয় জয়া তার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারছে না।

কিন্তু আজ আর অজিতের সেকথা মনে হলো না। মনে হলো সে যেন এখানে এক অবাঞ্ছিত অতিথি।

সত্যিই তো! জয়া সবই জানে।

অজিতেরও কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করছিল, কিন্তু সে লজ্জাটা কাটিয়ে দিলে সুহাস। হাসিতে কথায় ভুলিয়ে রাখলে, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে।

স্টুডিও থেকে অজিত যে তাদের ফটোগুলো সঙ্গে এনেছে সেকথা সে বলেনি এতক্ষণ: মনেও পড়েনি।

সুহাস মনে পড়িয়ে দিলে। বললে—খেয়ে দেয়ে চলুন আমরা বেড়াতে বেড়াতে দশাশ্বমেধের দিকে যাই।

অজিত বললে—কেন?

সুহাস বললে—ফটোগুলো কেমন হয়েছে দেখে আসি।

অজিত বললে – যেতে হবে না। আমি সঙ্গে এনেছি।

এই বলে সে তার পকেট থেকে বড় খামখানা বের করে সুহাসের হাতে দিয়ে বললে—বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

—ছবি খুব খারাপ হয়েছে বোধহয়।

অজিত বললে—বের করে দ্যাখো না।

সুহাস দেখলে। চমৎকার ছবি হয়েছে।

—দেখুন, জয়ার ছবিটা কিন্তু আমার চেয়েও ভালো হয়েছে। দাঁড়ান তাকে দেখিয়ে আনি।

ছবিগুলো নিয়ে সুহাস ভেতরে চলে গেল।

অজিত ভাবলে, সুহাসের অনুরোধ ঠেলতে পারলে না তাই, নইলে এ নিমন্ত্রণটা তার যেন না নিলেই ভালো হতো।

খানিক পরে ছবিগুলো হাতে নিয়ে সুহাস ফিরে এলো।

—হ্যাঁ, ওরও পছন্দ হয়েছে। কিন্তু ও বলছে ওর চেয়ে আমার ছবি নাকি ভাল হয়েছে। দাঁড়ান, দিদিকে একবার দেখাই।

সুহাস বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

মাধবীর বাড়ি বেশী দূরে নয়। কিন্তু মাধবী যদি তার সঙ্গে এ বাড়িতে আসে? যদি বলে, আপনি কে? যদি বলে সুষমার মুখে শুনেছি আপনার কথা। কিন্তু আপনি না দেশে চলে গিয়েছিলেন?

এমনি সব নানান কথা ভাবছে অজিত, এমন সময় সুহাস ফিরে এলো। বললে—দিদি কাল থেকে বাড়ি ফেরেনি। জয়ার মার কাছেই আছে বোধ হয়।

আরও বিপদে পড়ে গেল সে। অজিত ভেবেছিল, এখানে খাওয়া-দাওয়ার পর সে যাবে সুষমার কাছে। কিন্তু মাধবী থাকলে সেখানে তার যাওয়া চলবে না।

যাই হোক, এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার জন্যে অজিত বললে—তোমাদের খেতে কি খুব দেরি হবে ?

সুহাস বললে—তা একটু হবে বইকি ! জয়া নিজে যখন হেঁসেলে ঢুকেছে তখন—দেখবো নাকি একবার ?

অজিত বললে—ছ্যাখো।

কিন্তু দেখলে কি হবে, যত তাড়াতাড়ি ভেবেছিল তত তাড়াতাড়ি হলো না।

খাওয়া শেষ হতে দুটো বাজলো।

অজিত যাচ্ছিল সুষমার বাড়ির দিকে।

পেছনে হঠাৎ 'বল হরি হরি বোল' শুনে পথের একধারে সরে দাঁড়ালো। তাকিয়ে দেখলে শবযাত্রীর দল একটি মড়া নিয়ে এগিয়ে আসছে। যাত্রীদের সঙ্গে খালি পায়ে আসছেন অনিলবাবু।

অনিলবাবু দেখতে পেলেন অজিতকে। দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। —'বুড়ী পিসীমা ভুগছিল অনেকদিন থেকে, মারা গেল হঠাৎ। আমাকে শ্মশানে যেতে হচ্ছে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাঁচলাম মশাই। এই ধরুন।'

বলেই তিনি তাঁর কোঁচড় থেকে চাবির তোড়াটি বের করে অজিতের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন—স্টুডিওটা আপনি খুলে একটু বসুন দয়া করে। আমি গঙ্গায় ডুবটা দিয়েই চট করে আসছি।

অজিত জিজ্ঞাসা করলে—শম্ভু কোথায় ?

অনিলবাবু বললেন—পিসীমার এক দেওর থাকে ক্যানটনমেণ্টে। তাকে পাঠিয়েছি সেইখানে। সেও এক্ষুণি এসে পড়বে। আপনি আমার এই উপকারটুকু করুন দাদা !

কথা ঠেলতে পারলে না অজিত। তালা খুলে স্টুডিওর চেয়ারটিতে গিয়ে বসলো। ভাবলে, ভালই হলো। বিকেলটা এইখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে ইন্দুমতীর কাছে গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে অন্ধকারে গা ঢেকে চুপি চুপি সুষমার বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেই চলবে।

কিন্তু এমনি দুর্দৈব, বিকেল পার হয়ে সন্ধ্যা নামলো, কাশীর রাস্তায় আলো জ্বললো, তবু না এলেন অনিলবাবু, না এলো শম্ভু।

স্টুডিওর বাইরে এসে পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অজিত।

সুষমার জন্যে ভাবনা নেই, যত রাত্রিই হোক, দেখা তার সঙ্গে হবেই। ভাবনা শুধু ইন্দুমতীর জন্যে। তারা স্টেশনে যাবার আগে কাপড়-জামার ব্যাগটা অজিত সেখান থেকে নিয়ে আসবে বলে এসেছে। অথচ সে এখনও গেল না। এতক্ষণ তারা নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে। তার ব্যাগটা যদি পাঁড়েজির বাড়িতে রেখে যায় তো খুব ভাল হয়।

বীরেনের কি এত বুদ্ধি হবে ?

অজিত যে এমনভাবে বন্দী হয়ে পড়বে তা সে ভাবতে পারে নি।

সাতটা বাজলো।

ক্যানটনমেণ্টে ট্রেনের সময় আটটায়।

এখনও যদি আসে, এখনও সময় আছে।

স্টুডিওর ভেতর দেয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িটার দিকে অজিত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। টিকটিক করে ঘড়িটা চলছে। তারই সঙ্গে তাল রেখে অজিতের বুকের ভেতরটাও কেমন যেন ধকধক করছে।

অজিতের আর দ্বিতীয় বস্ত্র নেই, জামা নেই! যা কিছু আছে—সব ওই ব্যাগের ভেতরে।

অজিত ভাবছে ইন্দুমতীর কথা। যে-ইন্দুমতী তার সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করলে, তার কাছে আজ হঠাৎ মনে হতে লাগলো— সে যেন ছোট হয়ে গেল।

কী সে ভাবছে কে জানে।

কালই সে ইন্দুমতীকে একখানা চিঠি লিখবে।

ওদিকে ইন্দুমতী, এদিকে সুষমা।

মাধবী এতক্ষণ নিশ্চয়ই চলে গেছে। সুষমা একা।

জয়া যে তাকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে সে কথা জানে না সুষমা। বলতে হবে তাকে।

সেই সঙ্গে বলতে হবে—জয়া তাকে আর সহ্য করতে পারছে না।

না পারাই স্বাভাবিক।

এ সময় তাদের কি করা উচিত ?

সুষমা আবার গ্রামে ফিরে চলুক। সেখানে তার ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা সবই রয়েছে। অভাব কিছুই নেই।

চোখের সুমুখে রাস্তার ওপর দিয়ে লোকজন চলেছে। অজিত তাদেরই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই সব কথা ভাবছিল। ভাবছিল —এই যে এত এত মানুষ—ওদের প্রত্যেকেরই জীবনে এমনি এক-একটা সমস্যা হয়ত আছে। কেউ বা তার সমাধান করতে পেরেছে। কেউ-বা পারেনি।

হঠাৎ কি জানি কেন, ইন্দুমতীর মুখখানি তার চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো। নিতান্ত সাধারণ মেয়ে সে। তারও জীবনে এসেছিল এক জটিল সমস্যা। তাকে অবহেলায় পরিত্যাগ করে এসে সে নিজেই তা এনে দিয়েছিল। এখনও সে সমস্যার সমাধান হয়নি। নিজে সে রয়ে গেল সুষমার কাছে। একাকিনী তাকে আবার ফিরে যেতে হলো তার গ্রামের বাড়িতে। সুষমার চেয়ে বয়সে বোধকরি

সে কিছু ছোটই হবে। দুটি সন্তানের জননী হলেও উদ্দামযৌবনা স্বাস্থ্যবতী এক গ্রামের মেয়ে সে। যৌন-জীবনের ক্ষুধা তার এখনও মেটেনি। কিন্তু অকস্মাৎ কোথা হতে কী এমন সান্ত্বনা সে পেলে যার জন্যে সে অনায়াসে বলে যেতে পারলো—'তার আর কোন দুঃখ নেই।'

এমনি সব এলোমেলো অনেক কথা—অনেক চিন্তাই অজিতের মনে আসছিল। ঘড়িতে আটটা বাজে।

সুমুখে তাকিয়ে দেখলে, হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে অনিলবাবু আসছেন।

—আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম অজিতবাবু, কিছু মনে করবেন না!

এখন আর মনে করে কিছু লাভ নেই। ট্রেন এতক্ষণ চলে গেছে।

অজিতের মনে হলো—তার জীবনের সেই গল্পটা—অনিলবাবু যেটা তাঁর কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন, কেমন করে সেটা শেষ করলেন সেই কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে।

কিন্তু এখন আর তার সময় নেই। অজিত ভাবলে, কাল থেকে আবার তাকে এই স্টুডিওতেই থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে। কালকেই জিজ্ঞাসা করবে!

—চলি তাহলে? কাল আবার দেখা হবে।

অনিলবাবু বললেন—আসুন। অনেক ধন্যবাদ।

অজিত চললো সুষমার বাড়ির দিকে।

বাড়ির সুমুখে গিয়ে সে থমকে থামলো। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে—কারও গলার আওয়াজ পাওয়া যায় কিনা। মাধবী যদি এখনও এই বাড়িতে থেকে থাকে, তাহলে কি করবে সে—সেইকথাই ভাবলে। থাকলেও এখন আর তার ফিরে যাবার পথ নেই সুষমার সঙ্গে তাকে দেখা করতেই হবে।

অজিত কড়া নাড়লে।

ভেতর থেকে ঝনঝন করে বেজে উঠলো সেই মেয়েটির গলা। আজ আর সে দোর খুলে দিয়ে তাকে ভিতরে যেতে বললে না। নিজেই তাড়াতাড়ি দোরের কাছে এসে দাঁড়ালো। রাস্তার আলোয় অজিতের মুখখানা ভাল করে একবার দেখে নিয়ে বললে—আপনি সেই লোক তো? সেই যে এসেছিলেন—

—হ্যাঁ আমি সেই লোক।

অজিত দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, মেয়েটি বললে—ভেতরে কোথায় আসছেন বাবু, কেউ তো নেই বাড়িতে। এ বাড়ি শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দেওয়া হলো।

এই বলে কাপড়ের তলা থেকে খামের একখানি চিঠি বের করে মেয়েটি অজিতের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে—এই নিন। এইটি নিয়ে আমি আপনার জন্যে একাই বসে আছি সেই বিকেল থেকে। পড়ে দেখুন, দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।

গলি রাস্তার আলোটা ছিল একটুখানি দূরে। অজিত সেই আলোর তলায় এগিয়ে গিয়ে চিঠিখানি খুললে। খুলতেই দেখলে—চিঠির সঙ্গে জড়ানো একখানি একশো টাকার নোট।

চিঠিখানি লিখেছে সুষমা।

—শুনলাম তুমি এসেছিলে। জয়ার বিয়ে বেশ ভাল ভাবেই চুকে গেছে।

শেষ পর্যন্ত যা ভয় করেছিলাম তাই হলো। মাধবী আজ ছুদিন ধরে এখানে বসে আছে। আমাকে সে একা এ-বাড়িতে কিছুতেই থাকতে দেবে না। বলেছে—জামাই-এর বাড়িতে থাকতে হবে না। তুমি আমার বাড়িতে থাকবে। আমিও একা-একা থাকি, তবু একজন সঙ্গী পাবো। বলেছে

এ-সবই হলো বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছায়। ছুঁড়ি ভগবান ভগবান করেই মলো। চেষ্টা করছে আমাকেও তার দলে টানবার। কাল আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তার গুরুদেবের আশ্রমে। আমার খালি-খালি মনে হচ্ছিল তুমি যদি সঙ্গে থাকতে।

এই-বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হলো। জানি তোমার হাতে টাকাকড়ি নেই। তাই একশ' টাকার নোট দিলাম এর সঙ্গে। তুমি অনিলবাবুর ওইখানেই থেকো। আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা কোরো না। আমিই দেখা করবো তোমার সঙ্গে।

আমার গ্রামের বাড়ি-ঘর, জমি-জায়গার ব্যবস্থা তুমি যা ভাল বুঝবে করবে। নইলে ফট্ করে সুহাস কোন্‌দিন গ্রামে গিয়ে হাজির হবে।

ইতি—

সুষমা।

মেয়েটি বললে—কি গো বাবু, চিঠি পড়া হলো?

অজিত তাকিয়ে দেখলে মেয়েটি তখনও দোর ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

—হ্যাঁ হলো। আমি চললাম।

মেয়েটি বললে—উনি জিগ্যেস করলে কি বলবো?

—বলবে, ঠিক আছে।

—ঠিক আছে কি বলছো? শোনো বাবু শোনো।

বলতে বলতে মেয়েটি তার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে—আমি সব বুঝতে পেরেছি বাবু। আর এরকম ব্যাপার কাশীতে একছার হচ্ছে। তোমার চিঠিপত্তর দিতে ইচ্ছে করে তো আমার হাতে দিতে পারো, মাকে আমি চুপি চুপি দিয়ে দেবো। কাক-পক্ষী

টের পাবে না। আমার ঠিকানাটা তুমি লিখে রাখতে পারো। হাজারবাগে থাকি আমি।

অজিতের কেমন যেন লজ্জা হলো। সবই বুঝতে পেরেছে মেয়েটি।

অজিতকে চুপ করে থাকতে দেখে মেয়েটি বললে—আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না? কাল কখন আসবে আমার বাড়িতে বল আমি সেই সময় থাকবো।

অজিত বললে—সুষমাকে বোলো আমি দেশে চলে গেছি।

এই বলে অজিত আর সেখানে দাঁড়ালো না।

মেয়েটি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

অজিত বেনারস ক্যানটনমেন্ট স্টেশনে এসে দেখলে মোগলসরাই যাবার একখানা ট্রেন তক্ষুণি আসবে। দেশে যেতে হলে মোগলসরাই-এ গাড়ি বদল করতে হয়। ইন্দুমতীরাও নামবে মোগলসরাই স্টেশনে।

টিকিট কিনে অজিত ট্রেনে চড়ে বসলো।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই।

মোগলসরাই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বীরেন সিগ্রেট টানছে ঝুনু টুনুকে নিয়ে ইন্দুমতী বসে আছে একটি বেঞ্চের ওপর।

অজিত কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ইন্দুমতী বললে—ব্যাগটা নিতে তুমি আসবে আমি জানি।

অজিত বললে—ব্যাগ নিতে আসিনি আমি।

—তবে? কি জন্যে এসেছ?

অজিত বললে—আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।

ইন্দুমতীর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুলো না। চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে এলো শুধু।

—শেষ—